

জানুয়ারি ১৯৫৯

গ্রন্থস্বয়ং : শ্রীমতী তারা সেনগুপ্ত

প্রকাশিকা :

সুধেকা দাস

অন্নবল্লী

৭৬/১১ অধিনাশ ব্যানার্জী লেন

হাওড়া-৭১১১০৪

মুদ্রাকর :

উপেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস

১৬, ভীম ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

পরিবেশক :

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন

৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

প্রচ্ছদশিল্পী :

সুধাঙ্কর সেনগুপ্ত

ଉତ୍ତମ

ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମହାବଳୀ

সাদা বকনা বাছুর কোলে নিয়ে একটা মানুষ মাটির সড়ক ভেঙে যাচ্ছে। বটিশ
সড়কের মাঝারি স্বাস্থ্যের কালো পুরুষ, গায়ে জেলজেল সাদা হাফশার্ট, কোমরে বাঁধা
খট্টর সামান্য নিচে ঘের ঝোলা লাল সবুজে লুঙ্গি, পায়ে লাল ধুলোর রেগু আবরণ।
কম ধরে বাছুর বহনের জন্যে পুরুষালি সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটা মূখের চোয়াল শক্ত,
চোখ ক্ষীণ, দাঁতে দাঁত, লোমকূপ ভিজিয়ে ঘামগড়ানির অস্বস্তি জ্বালায় কপালে গালে
চিবুকে কৃষ্ণ, হাতের ছাঁদে তার টানদাঁতে শিরদাঁড়া ঝোঁকা, পা ফেলায় জড়টান।
দেখে মনে হতেই পারে হাত ছিঁড়ে বাছুরটা পড়ে যাবে।

সড়কে দেখার মানুষ নেই। সামনে ক্ষুদ্রা একটা কালভার্ট। কালভার্টের নিচে
ভাঙচুর খালটির স্বল্পায়তন কাছাকাছি জলে দুটো বক, কাছাকাছি গুরুশালিক হাঁটা-
ফেরা করছে, খালের ধারে বাবলাগাছে হস্তত ফিঙে কি টিয়া কি চড়াই, উড়ানে
ঝোকা যায় না, ওঁচিকে বনপায়রা গুড়িকর নেমে ঠোট হাতড়ানিতে ব্যস্ত, খানিকটা
দূরে এক মেয়েমানুষ খোপের পাশে ঝুড়ি রেখে ঝুঁকে আছে ঝোপে, শুকো কাঠকুটো
সংগ্রহ করছে বোধহয়, আর একটা প্রাণী মানুষটির পিছনে হাতদুই দূরে, গায়েরই
সান্তার কালো একটা কুকুর। মধো মধো চোখ ভোলায় একটা মতলব তার কাজ
করছে। ধরেই নিয়েছে বাছুরটাকে ভাগাড়ে ফেলতে যাচ্ছে, তার খাদ্য হবে, লম্বা
লালাসিক্ত জিভে তারই খরানি টেনে চলেছে।

কুকুর কেন মানুষ দেখলেও এটা ভাববে, 'বাড়াতে' চলেছে বদ্বি। 'বাড়ান'
হল মৃত গরুকে ভাগাড়ে ফেলা। ফেলা বলতে নেই, ভগবতীকে অগ্রদ্বা জানান হয়,
এবং এ কর্মে সহযোগিতা চাইলে, না-করা পাপ। কিন্তু মরেনি তো, মরে যাবে এটা
প্রায় নিশ্চিত করতে চেহারার গাঢ় ছায়া ফেলেছে, মাংস শুকিয়ে হাড়ের উপর চামড়ার
লোম খসা কালি বর্ণ নিয়েছে, পা গোড়ায়, পেটে চোনা আর গোবর ছিড়ানির দাগ
নিয়েছে, চোখের আশেপাশে জল করানির পিছুটি আর কালো আন্তরণ গড়েছে।
গোপালপুরের পাঁচু গো-চাঁকছে করে, জ্যাঠার শিক্কে। গাছের ছাল, পাতা, জড়ি-
বৃতি, হুঁকোর জল, আখের গুড়, আধা, মধু, ভাতের ফ্যান ইত্যাদি ইত্যাদির
অনুপানে বিস্তর ওষুধ চালিয়েও কিছু হল না। শিবপুরে তাই গরুর ডাক্তার

দেখাতে নিজে যেতে হচ্ছে। সরকারী প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্র। ইনজেকশান, ক্যাম্পাস ট্যাবলেটে যদি বাঁচ।

বে-আকস্মিক সূর্যের অগ্নিভরঙ্গ চাটাল জ্বলত হয়ে চামড়া চাটোর ছাঁকা লাগাচ্ছে। বোশেখের দশটা বেজে যাওয়া মানেই মধ্যাহ্ন। ফাল্গুন চৈত্রেই প্রকৃতি সরসতা মূছে এখানে নারকেল খোল। কালবৈশাখীর হাউল করুণার আবহমণ্ডল মিশ্র হয়, ভারও দেখা নেই। মাটি ঠুকলে কীসার বাসনের বর্ষিক ঠনঠনানি উঠবে, বাতাসে অম্বাভি, কণে কণে পিপাসা, আলপথ, শূন্য ক্ষেত্র, মাটির সড়ক, কিম্বদা গাছ, শূকো কোপকাড় হাঁ হাঁ করছে। কণ্ঠনালী শূন্যকরে কাঠ হয়ে যাচ্ছে মানুষটায়। সামান্য পথকে ক্রম বর্ধিত রোগে ধরেছে। টানা নিরে যাওয়া যায় না। একবার করে নামাতেই হয়, আবার তোলাতে ঝিগুণ ভার হয়। ওদ মানুষটা নিরে যাবেই। ফেলার পাঠ নয় মানুষটা, টের পেয়ে কুকুরটা পিছ ছাড়ে।

মানুষটার নাম অটল। বকনটা তার নিজের। অটল 'গার্মিটপালের' বাগাল। গার্মিটপাল হল গায়ের বিভিন্ন ঘরের গরু চরান পাল। একটা দড়ো গরুর জন্য তে বাগাল শোষা যায় না। যাদের বেশি গরু তারা পোষে বাগাল। অটলের কাজ সকালে গরু খুঁলে সারাদিন চারিয়ে বিকেলে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া। গরু পিছ রেটে পাঁচ টাকা, বাছুর ছাড়, গাই দোহান থাকলে আলাদা সাত টাকা। অটলের পাল বিশাল নয়। পঁচিশও হবে না। কোনক্রমে তাকে চালাতে হয়। খেয়ে না খেয়ে চালান জন্ম-স্বভাব অটলদের। কিন্তু স্ত্রী চিনির মৃত্যুরোগের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ঘেন্দার হতে হয়েছে।

অটলকে দেনা দিয়েছে ছিদাম। চিনিকে বাঁচাতে টাকার জন্যে হনো হয়ে যাচ্ছে এখন। বন্ধুর ঘরে কীসার থালা বাঁচি, রুপোর হাঁসুলি, হার সূদে জন্ম হয়েছে। কিছু দাও বলতে বন্ধু গড়গড়িয়ে সূদসমেত হিসেব ধরিয়ে দেয়। সামগ্রী আন, টাকা নাও। যা নিরেছ তাতেই তোমার কোমরের লুঙ্গিটা পর্যন্ত খুঁলে নেওয়া যায়। এদিকে ঘরের বিছানায় চিনির কাতমানি। হাঁড়িতে একমুঠো দেবার মত চাল নেই। তার অমন জলজল বোঁ কেন প্রতিনী। পড়শীরা বলে, 'মরবেক গো অটলের মাগ'। সামনে বলে, 'আহা হা সোনার পিঁতিমে কাঠিসার, ও অটল বড় ডাক্তার বিদ্যা, ভাল হনু বাবে।' কেউ বলে, 'আয়ের খান নিরে যা, কাড়কু'ক করা।' উপদেষ্টার পাহাড়। পাঁচটা টাকা ধার চাইলে দরদ বাত্প উঠাও। এদিকে ডাক্তার-বাৎ, কলস করে লিখে যাচ্ছেন। চিরকুট ওষুধের দোকানে ধরতে চাঁচল-পঞ্চাল। এখনই ছিদাম বলল, 'লাও গরুসা, লোথ বিবে এখন।' তারপর দশ বিল পঞ্চাল করে

সাড়ে তিনশ। সন্দের কথাই নেই। আহা, বড় মারার শরীর ছিল ছিদামের। হ্যাঁ, ছিল। ফট করে মরে বসেছে। বৌ বাপের ঘরে চলে গিয়েছে। তাকে কেনা দেওয়ার কথা জানেই না। তা বলে কেনা তো উঠে বারনি। ধর্ম আছে না। মাথার উপরে অদ্ভুত সহস্র চক্কু আছে না। দিনে সূর্য আর রাতে চাঁদ নক্ষত্রের চোখ বলে না তাঁর। ফলে খাও না খাও, টাকা দিতেই হবে। চিনি শেষপর্যন্ত মরেছে, সে তো মরেনি। ছিদাম মরেছে, ওর বৌ আর ছেলেমেয়ে তো মরেনি।

ছিদামের মাটির দোতারা ঘরে তালা ঝোলে। উঠোনের বেড়া উধাও। ওদিকে খামারবাড়ি ফাকা। ঘরের উঠোনের ভাঙ্গাঘাটের দ্বার খুঁশী ডাল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ ছিদাম যখন ছিল, কী লক্ষ্যশীল ঘরের। গল্পদের এগার বিঘে জমি চষত। কী সুন্দর শ্বাস্তা, গাটীগোটা, শক্ত ও ধরত। বৃকে বাধা, ডাক্তার আসার ঐশ্বর্যশক্তি রইল না, মরে বসল।

আমোদপুরে ছিদামের শব্দরঘর। বৌ সেখানে আছে। অটল সপ্তর করে আসছে। হলেই দিলে আসবে। ধর্মকে সে বলে, 'শোন ধরম, আমি ঠিক শোধ দেব। একটু ধৈর্য ধর বাপ।' মহাশূন্যের সহস্র চক্কুকে বলে, 'তুমি তো দেখছ আমি চেঁচা করছি।'।

ধর্মকে বড় সমীহ করে অটল। এই ধর্মের জন্যেই বকনাটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া। আশ্রয়ে রয়েছে গোধন—অবলা জীব—তাকে দেখা তোমার ধর্ম। তার আহার, সুখ সৌভাগ্য, অসুখবিসুখ সবই তোমার দায়িত্বে। মারা নয়—মারা করতে অটলের বয়ে গিয়েছে। তার চলচল চেহারার শ্যামলা অমন সুবতী বৌ, বড় বড় চোখ, পাতলা ঠোঁটে হাসির ঝিলিক, অমন সুডোল স্তন, হাটলে ছন্দ গড়ে শরীর, বৃকে জড়ালে নরম ফুলের স্তূপের মত সৌগন্ধ আর স্বাদে ভুবে যাওয়া ঘটে, সে মারা যার, মারা যেতে পারে যখন, তখন দুনিয়াতে কী থাকল না থাকল তাতে বয়ে গেল অটলের। এই যে খড়ো চাল তার ঘর, বারান্দা, উঠোনের সজনেগাছ, স্তলপশ্ম কিংবা পাড়াপড়শী কিংবা এ গ্রামখানাই থাকল আর গেল, ও নিয়ে অটলের মাথা-ব্যথা নেই। তবে হ্যাঁ, ধর্ম বলে ব্যাপারটা রয়েছে, বা দেহ গেলেও ছাড়ো না, আত্মার সঙ্গী হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে অটলের অগাধ বিশ্বাস। পড়াশুনা করেনি, মা ছিল, শৈশবে মরেছে, গরুবাগালি করছে দশ বছর বয়স থেকে, তার আগে ন্যাথটো হয়ে ঘোরা, মাছ শাক করা, বাপের পিছনে থাকা। বাপ চাষ করত সিঁহিঘের জমি। সে জমি হয়ত পেত, তিসু গরু, বাগালিতে সে মত্ত হয়ে থাকল। ওই বাপও ছিল বড়ই ধর্মভীরু। বলত, চুঁরি করাবি না, পনের কোঁত করাবি না, নাথ্য লিবি,

নাচা দাঁবি, মিথো বলবি না, সবার মধ্যে ঠাকুর থাকে, প্ৰকামাকড় সাপখুপ, বাঘ
শিয়ের, বড়লোক ছোটলোক সবার মধ্যে । কাটকে কটে বিলে ঠাকুরও কটে পায় ।
আর ভাবিস্ লুকিন্ করাহ, হু, হু বাবা লুকোবি কাকে । হাজার চোখ । যিনের
বিলা সুখির চোখ বলে, রাতে তারা আর চাঁদ, তু কী করাহিস্ সব দেখে । সব
লিখা থাকে । তুমি ধম্মে আহ, না অধম্মে আহ । তার বিচার হয় খাতা খুলে ।
যুধিষ্ঠির একটা কুকুরের লেগে সঙ্গের যায় নাই, ওই অধম্ম হবে বলে ।’

‘যুধিষ্ঠির কে বটে বাবা ?’

‘ধম্মপুস্তক । পাঁচ ভাইয়ের বড় জুনা । আহা মহাভারতের গম্প বলি নাই ।
গিন্নিমা সদর করে পড়ত । আমি ক’দিন শুনোছি । সেই কুরুক্ষেত্র ।’

‘ভীম গদাধু করোছিল । জানি । জানি ।’

‘হু । দ্রুম্যোধন রাজ্যের দের নাই । তার লেগেই কুরুক্ষেত্র । যুধিষ্ঠির
জেনে মিথো বলে নাই । তাই বোহি নিয়ে সঙ্গের বোহিল ।’

‘সঙ্গ আকাশের উপরে বটে, হুই বল ।’

‘হা । যুধিষ্ঠিরের পিছা নিয়েছিল, একটা কুকুর । সঙ্গের দুরোরে পেরাবা
ধরলেক, তুমি চল হে, কুকুর খেতে পাবে না । যুধিষ্ঠির বলে, তা কী হয় । আমার
সঙ্গে এসেছে, উকে ছাড়তে পারব না—থাকুক সঙ্গে । পেরাবা বললেক, সঙ্গ ঢেক
সুখ । নাচ গান আমদ্য, ঢেক ঢেক লুচি, মিষ্টি, ভাত । কী সুখ । যুধিষ্ঠিরের
লুভ হয় না শুন, বলে, আমি কুকুর ছাড়ব নাই, সঙ্গ কাজ নাই । তখন কুকুরট
—ওমা কুকুর কোথা ধম্মরাজ । বললেক, ধনি্য বটে তুমি । মান্দ্য লও দেবতা ।
পরিলে করিছিলাম ! যাও সঙ্গ । তুমি ধম্ম মান, না মানলে নরক । তা দেখেছিস্
ত বাপ নরকের ছবি, ওই যি পট দিখাতে আসে ।’

দেখেছে অটল । পট্টরারা গো মঙ্গলের গান করে । পাকানো ছবি খুলে খুলে
দেখায়, নরক বর্ণন করে, চিঠ থাকে ফুটন্ত তেলের কড়াইবে ডোবানোর, কাঁটাগাছের
সঙ্গে ছেপে বেঁধে রাখার, তপ্ত লোহার ছাঁকা দেওয়া, সাপ বিছের কিলবিলা করা ঘরে
টুকিয়ে দেওয়া, কত—কত—যন্ত্রণাধম্ম মান্দ্যের কী আত’বাব । কতবার পট্টরারা
আসে, কতবার দেখায়, কিন্তু মান্দ্যের দড়ো কান, এ-কানে ঢুকে ও-কানে বেরিরে
যায় । অটলের বের হয়নি ।

শিবপদ্র ঢোকায় আগে আমার বাগান, বাঁধকে পুকুর, সামনেই পোস্টোপিসের
টিনের চাল, তারপর চারটে ঘর পেরিরে মুড় । বাস ঘাড়ার, বোকানবান, মন্ত
একটা কটরাছ, তার পাশেই প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্র—ডাক্তারখানা ।

ডাক্তারবাবুর ধাঁড়ির উপর সাধা শাট গোলগাল করসা চেহারা, ভারী মূখের চোখে চশমা। বড় মেজাজী মান্দুৰ। তবে দু-পাঁচ টাকা দিলে মেজাজের উপর সর জমে যায়। সরকারী ওষুধ, টাকা লাগবে কেন? না দিলে যে ডাক্তারের গা নড়ে না। পরসা ছাড়া দুর্নিরাত্রে কাজ হয় না। তারপরও আছে, 'কী নাম তোরা, লাউ হয়েছে ঘরে', 'ওরে মুরগী নেই ঘরে, ডিম আনতে পারলি না'। 'সজনে ডাঁটা খেতে খুব ভালবাসি, দিস্ তো দু গড়া।'।

বকনাটাকে দেখামাত্র মূখ বেঁকে যায়, 'মরাটাকে এনেছিচ্ কেন? ভাগাড়ে দিয়ে আর। ভাগাড়ে দিয়ে আর।'।

'এ'জ্জ বে'চে রইছে।'।

'নেই। কোন শালা বে'চে নেই, তুইও না, আনিও না। ক'দিন এই দশা!'

'এ মাসতিনেক হবে। আগে অ'বিশি—'।

'ক টাকা এনেছিচ্?'

পাঁচ টাকার নোট অটল টেবিলে রাখে। ডাক্তার খয়েরী সাধা গুড়ি বেন কাগজের মোড়কে, টাবলেটে দেন। ভাল করে খাওয়ানোর কথা বলেন।

মোড়মাথায় অটল বকনাটাকে ওষুধ জল খাওয়ান। তেঁটো পেরেছিল বটে। তাধ বালতি শেষ করল। দোকানদার বংশীকে বালতি ধুয়ে আবার দিয়ে এল। একটা খড়ের আঁটিও সংগ্রহ করে পাশের খামার থেকে। বটতলায় বকনা বেঁধে আঁটি ঝুলে দিল। নিজে বংশীর দোকানে পাউরুটি, চা খেল। বাড়ি বাবে বিপ্রান নিয়ে, এখন উভয়েরই জিরেন। বাড়ি ধরিয়ে দেখল দু'দিকের দুটো বাস আসা, মোটরসাইকেল, স্কুটার, লরি ছোটো, মানুষের চলাচল। তারপর বকনাটার ঘাড় হাতে নিয়ে বলল, 'লে, ইবার নিজে চল্ দেখি।'।

দাঁড়া হাঁটে বকনা। বাহু, মনে হচ্ছে ঘর পর্যন্ত যেতে পারবে নিজের পায়ে। ওষুধের পুঁরিল্লা কী কাজ দিল, হতে পারে। তবে ঘর ফেরা গরুর চহট্টই অন্যরকম। ভারী বাস্ত হয়ে ওঠে। ঘরের টান বলে কথা। মাথায় আলো-তাপের রাগী সূর্য, কিছু বকনা হাঁটার হর্ষেই একটা ছাতা নির্মিত হয়ে যায় বন্ধি!

হাঁটে হাঁটে অটল ভাবে, পালের গরু চরাতে দিয়ে এসেছে ভোলাকে। পাঁচ টাকা দিতে হবে। ওষুধে লাগল পাঁচ। মোট দশ। তারপর এই শ্রম বকনাটার জন্যেই তো। আর এর জন্য দায়ী চিনি, তাকে শূন্য করে মরে যাওয়া বো। গরু না হলে ঘর মানায় না, লক্ষ্মী আশ্রয় হয় না। চক্রবর্তী ঘর থেকে পালানি নিল বকনা। গাই হল, বাছুরটা তার পাওনা, আবার গর্ভবতী হতে ফেরত বিল গাই,

বকনা থাকল ঘরে। কিন্তু কী যে হল, আসলে চিনি বিছানার, বকনার বসআঁকি হয় না, রোগ তো ধরবেই। রাগ হয়ে যায় অটলের। ঘর মানার না। গরু না থাকলে ঘর মানার না, ঘরের দেওয়ালে খড়মাটি না দিলে ঘর মানার না, একটা ঘাওয়া চালা না করলে ঘর মানার না, উঠানে বারমাসে লক্ষা, বেগুন, ছটকো তরিতরকারী না লাগালে ঘর মানার না, হাঁড়ি, কলসী, খাসা, বাটি, ঘট, বিছানা, দেওয়ালে কালী, শিব, লক্ষ্মীর ছবি না হলে ঘর মানার না—ঘর মানানোর জন্যে কত কী যে লাগে?

একদিন রাগ করে অটল গড়গড় এরকম বলতে চিনির কী হাসি। হাসির চোটে মথার চুল ভেঙে পড়ে, বৃকের আঁচল খসে যায়, একে বোঁটে ওঠে, যেন শীঘ্রের ভায়ে সোনালী ধানের গুচ্ছটি। সাপটে ঘরে অটলের চুন্দু খাবার হঠাৎ তখন আকুল-বিকুল। চিনি তখন সরে যায়, 'এ মা, তুমি কী—দিনের বেলা।' বলে, 'এই বললে না ঘর মানানোর লেগে একটো বোঁ লাগে।'

অটল ভাবে, ঘর মানানোর বোঁ পেয়েছিল বটে, কিন্তু সুখ তাকে দিতে পারেনি। সুখ যেন পাখি। পছন্দ নাচাচ্ছে ডালে বসে। ধরতে গেলেই আরও উঁচু ডালে, এক গাছ থেকে অন্য গাছে। অমের সুখ, খাড়ি গয়নার সুখ, ঘরের সামগ্রীর সুখ কিছুর না। বৃকে মোচড় লাগে ভাবতে। গরুবাগালির উপার্জন আর কত। তবে চিনি বৃক্খী ছিল না। বৃক্খী ছিল ঘর মানানোর জন্যে আর একটি জিনিসের জন্যে। সে ছেলে। ও জন্যে যেন সাধনাই সুরু করে দিয়েছিল। শাস্ত হয় না, সাস্থনা শোনে না। ভেলেপিলে হবার জন্যে এটা সেটা খেয়েই মেয়েমানুষের শরীর নষ্ট হয়। পুজো মানত, কবচ তামিজ ধারণ তো ছিলই, তার সঙ্গে জড়িবাঁটি খাওয়া। কে জানে তাতেই শরীরে বিষ হয়েছিল হয়ত।

ঘর মানাবার জন্যে মরে বসল, এখন দেখে যা তোর ঘরের হাল। বৃকের মধ্যে শোকে কালো জলের ছলাচ্ছল শব্দ। অটলের বেবনা ডিঙি তাতে টালমাটাল হয়। ঢেউ ভাঙতে হালের টানুনি শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে দেয়। সে ঘর পরিষ্কার রাখে না, মেখে নিকোন না, ঝাট দেয় না, জল না দিয়ে লক্ষাগাছ মারে, খড়ের চালে খড় গোজে না, ভাতের হাঁড়ি মাঙে না। লক্ষ্মীহীন ঘরে শব্দ স্থলপশ্মটী ফুল দেয়। জললে পাতার আড়ালে গোলাপি ফুল ফোটার। ফুলেরা শোক বোঝে না।

হাতের ঘড়িতে চীন, পিছন ফেরে অটল। বকনাটা আলের নিচে ঘাসের দিকে মূখ বাড়িয়েছে। আঁহা থাক, সে ঘমকে যায়। শৃকোর সঙ্গে সবুজ কটা হাস। এখন সেও আগুন থাকলে একটা বিড়ি ধরাত। হাঁটীছিল বেশ, ঘাড়োতেই রোখটা কামড় দিতে শুরু করে। বকনাটাকে জোর করে সে টেনে নিয়ে চলে।

সামনে কাঁদর, বাঁকা-চোরা ঝাল। ইট বেয়ুনো সাকো ঝালটোর। পাশে খেজুর গাছ। ডান দিকে থেকে বাছে রাওতাড়া। চাষী মানুষের গাঁ। ঘরে ঘরে ধান্য-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে। আলপথ ছেড়ে আবার মাটির সড়ক ধরেছে অটল। আর মাইলটেকেরও কম। খানিকটা হাঁটতেই লম্বা বড় দাঁঘি। বৈশাখেও জল থাকে। পশ্ম কোটে দাঁঘিটোর। কালো জল পশ্মপাতায় ঢাকা, ধারে দল, শোলা, নানান জলজ উদ্ভিদ।

অটলকে দাঁঘি পার হতে হল না। পদ্বপাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা। মাঝামাঝি যেতেই চোখে পড়ল, ওদিকে একটা মানুষ উপড় হয়ে পড়ে। ঘাড় গর্ভে আছে একটা সাইকেল। বকনার ঘড়ি ছেড়ে ঢালে দ্রুত পায়ে নামে অটল। চিনতে পারে, এ যে দে'তো জগা। পাজামার উপর সবুজ হলুদ ডোরাকাটা গেঞ্জি, কালো হাতে স্টিলের বালা, অন্য হাতে ঘড়ি, এক পায়ে হাওয়াই চম্পল লেগে আছে। মাথা ফেটে রক্তে ভাসছে মানুষটা, কাতরানি উঠছে যন্ত্রণার।

‘কী হল! সাইকেল থেকে পড়লে!’

চোখ মেলে তাকায় জগা। যন্ত্রণার বিকৃত মুখ, চোখ রক্ত ভেজা, গাল কাঁধ, গলা রক্তে ভাসছে, কাতরাতে থাকে, ‘তুল আমাকে।’ নিজেই উঠবার চেষ্টা করে। পারে না। যন্ত্রণার শব্দ তোলে কেবল।

‘দাঁড়া-দাঁড়া তুলছি।’ অটল তুলতে গিয়েও থমকে বলে, ‘এ হে হে রক্তের বনো বইছে। ফেট বেঁধে লে। এই আমার গামছা রইছে।’

‘একটুস্ জল।’

‘দাঁড়া, পুখোর থেকে আনি।’ অটল পুকুরে ছোটে। হাতের আঁচলার জল তুলতে গিয়ে চোখে, আঙুলের ফাঁকে বোরিয়ে ধাবে। গামছাটা ভিজিয়ে নেয়। তারপর হাঁ মুখ করতে জগা, গামছা নিগুরায়, রক্তের সঙ্গে জগা পান করে জল, ‘আঃ’। অটল বলে, ‘মাথাতে গামছা বেঁধে দি। কিন্তু ডাক্তার লাগবেক। করি কী।’ বলতে বলতে গামছা বাঁধা হয়।

‘তুমার লেগে বাঁচলম।’

‘বাঁচলি কুখা। গামছা কি রক্ত আটকাবে? গলগলিন্ বেরুছে।’

‘ফনে মর্দা আর ধীরে বাউরিকে খবর দিতে পারবে?’

‘খুব পারব।’

‘তাহালে যাও।’

অটল আর দাঁড়ায় না। থাক বকনা। সে ছুটেতে শব্দ করে। ভাগ্য বলে

জোড়াকে পেয়ে বার তেতুলডলার। বলামাত্র সাইকেল বের করে অটলকে নিয়ে বুকুনে আসে।

অটলের আর কোন দায় নেই। শিবপুর মোড় নিয়ে বাওয়ার ব্যবস্থা করে ওরাই। সাইকেলে বসার কোলপাকী করে। পড়ে থাকে জগার সাইকেলটা। অটল ভাবে, বাঁচবে কি। এত রক্তপাতের পর মানুষ বাঁচে? বাঁচতে পারে। মৃত্যুর হালচাল বড় বিচিত্র। সে কখন হাত বাড়ায়, কেউ টের পায় না। কিন্তু একনাটা গেল কোথায়? অটলের চোখ খুঁজে বেড়ায়। গায়ে মৃত্যুর কাছে ডোবা। ডোবার গর্ভে শূন্য জায়গার সবুজ ঘাসের ছাউনি। খেয়ে চলেছে একমনে। দেখে নিশ্চিত হয়। আবার যেতো জগার রক্তাক্ত মৃত্যুটা মনে পড়ে। ভাবে, জগা আছাড় খেয়েছে না কেউ মেরেছে! মারতে পারে। জগা ডাকাত, শত্রুর অভাব নেই, ও মরলে অনেক খুশী হয়। তাহলে কেন সে বাঁচাল? বাঁচাবে না? মানুষের খমই তো বাঁচানো, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, যন্ত্রণাদেশকে শাস্তি দেওয়া। আহা, জগা বাঁচুক। ওর শরীরের সব বদরঙ বেরিয়ে নতুন রঙ আসুক। অটলের ভাবনায় সারাতন্ত্রী জুড়ে বইতে থাকে এক অনুভব, যার ভাষারূপ, মানুষের বড় বাঁচার সাধ গো। চিনিরও বড় বাঁচার ইচ্ছে ছিল। কাঠিসার হাতের আঙুল খামচে ধরে বলত, ‘আমি বাঁচব গ—বাঁচব—মরতে আমার খুব ভয় লাগে। আমাকে মরতে দিও না। বাঁচাও।’ কিন্তু মৃত্যু শুনল না। চিনিয়ে নিয়ে গেল। চিনির বাঁচার আত্ম এখনও ঘরের বাতাসে ধমধম করে। আহায়ে জগাও তো বাঁচতে চায়। দাঁও বাঁচতে দাঁও।

অটল একনাটা ডাকিয়ে ডোবা গর্ভ থেকে রাস্তার আসে। বাঁ দিকে তালবুন্য-দাঁঘি। ডাইনে পাথুরে ডাঙা। দেখা যাচ্ছে চকার কোপকাড়, ঘরবাড়ি। অটলের ঘর চকায়। গায়ের কাছাকাছি গিয়ে একনাটা ছেঁড় দেবে, চরবে ওটা, বেলা গড়ালে ঘর নিয়ে যাবে। এখনও টের বেলা।

গ্রাম হিসেবে চকা একটা নাম হলেও গোপালপুরেরই অংশ। বিচ্ছিন্ন করেছে মাঝের ফুটবল গ্রাউন্ড আর গুটি আমগাছের একটা বাগান। গোটা সাতেক গাছ নাশ। চকার বাসিন্দা প্রশংসার। লোকসংখ্যা সওয়া দুশো আড়াইশ। অঁকড় আঁকড়োপ, আম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল, বাঁশ, পাকুড় আর বটগাছ খড়ো চাল নাটির ঘর, নিকোন উঠান খামার বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। বনবিভাগের দাক্ষিণ্যে ইউক্যালিপটাস সোনাতুরিও গায়ে এখন মাথা খাড়া করে। ডোবা ছাড়া, বাঁদিকে

একটা দাঁড়িও রয়েছে। বাসিন্দারা সবই তথাকথিত অভ্যাজ প্রেশীর। ভূমিহীন অথবা দূ-পাঠ কাঠা ভেস্ট জমি প্রাপক, মজুর, কিষাণ। কাঁগারি, গরুবাগালি, কিংবা মুনিক খাটুনির জন্যে গোপালপুর কিংবা শিবপুরের, রাওড়াড়ার সম্পদ চাষী কিংবা চাকুরিজীবী পরিবারে যেতে হয়। চকার প্রাথমিক স্কুল হয়েছে। খড়ো চাল মাটির ঘর। কিন্তু প্রাথমিক ডিঙোনো ছেলে নেই। পঙ্কায়ত সদস্য বাবলা বাড়ির। নিজের নাম সই করতে জানে, গায়ে মোড়ালি তারই।

অটলকে স্কুলের সামনে সহদেবমাস্টার ধরল। হাতে তালপাতার পাখা। নিমগ্নাঙ্কুর ছায়ার চেরারে পা তুলে বসে আছে। স্কুলঘরের দেওয়ালে সাইকেলটা ঠেস দেওয়া। ছায়ার সাতটি ছেলেমেয়ে, প্যান্ট, উদ্যোগ গা, মাথার রুখ চুল, ওদের পাশে দু'টো সাধা ছাগল বসে।

‘কী হয়েছে রে অটল?’

‘আজ্ঞে।’

‘ওই যে ফনে আর ধীরেকে নিয়ে গেল সাইকেলে! কুখা?’

সহদেব কালো রোগা বেঁচে। ধূতি হাটুর ওপর তোলা, গায়ে খন্দরের পাঞ্জাবি, গেঞ্জি নেই, বুক দেখা যাচ্ছে। নকোশ গায়ে বাড়ি। নিজেই জমিতে লাঙল মারে। হোটছেলে কলেজে পড়ে। বড় বিএ পাশ করে বসে। চাষে লাগতে বলাতেও ছোড়ার আগ্রহ নেই, চাকরি কববে। অবিনাশের পিছনে ঘুরে ভোট করেছিল, নিশিচন্ত হওয়া গিরেছিল তাতে, পার্টি তো কম্পতর, বিস্তর না হোক খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা তো হবে, কিন্তু ভোট গেল, কোথার চাকরি। এক প্রাইমারির ঘরজা যদি খোলে, হাইকোর্ট করে বসে আছে। সংসার অবশ্য এমনিতে সচ্ছল, জমি এবং শিক্ষকতা, এখন দুইই দুখেল কালো গাই।

‘দেঁতো ভগা রক্তকান্ড, হয়ে পড়ে আছে। দেখে উদিকে ডাকলম্।’

‘কুখা রে? আঁ, বেঁচে আছে না ফট?’

‘বেঁচে আছে। কথা বললে।’

‘চোট কোথায়? টাঙি চালিয়েছে, না ছোরা?’

অটল বলল, ‘তা কেমন করে জানব?’

‘আরে তুই প্রত্যক্ষদর্শী। জানবি না মানে!’ পাখাটা জোরে জোরে ঢালাতে থাকল সহদেব। তারপর কী মনে হতে চেরার ছেড়ে উঠে সামনে এল। স্বয়ং নিচু করে বলল, ‘বল্ কেনে, ডর কিসের? আমি দারোগা বটি না পদালিশ। হারামজাদা বেড়োছিল খুব। বত চুরিচামারি সবে উ। মোড়লঘরে ডাকতিও শালার কীর্তি!’

কন্ কেনে—এই অটল ।’

‘কী বলব । কে মেরেছে না পড়েছে জানব কেমন করে । বেশি মাথা ফাটা, উঠতে পারে না, জল চাইলেও, দিলমু, তাবাবে খপর দিতে বললেক । ওরা নিয়ে গেল ডাক্তার দিখাতে হাসপাতাল ।’

‘এ বাস্তা বীচবে, না মরবে ? হঃ, নিকেশ করে দিতে পারল না ।’

‘আমি না গেলে নিকেশ হয়ে কেত ।’

বিরাজিতে মৃদু বেকাল সহবেব, ‘তাহালে উদ্ধার করোছিস্ বল ।’

অটলকে হাটতে দেখে বলে, ‘আরে আরে চলে যেছে দেখ । দাঁড়া । কী রাজকার্য আছে তোরা ।’

‘রাখতে হবে । ভোলা গরু চরাছে, গরুর পাল ঢুকবে, দেখতে হবে নাই ।’

‘হ্যাঁ, তুই তো আবার হাত পুড়িয়ে খাস । বৃকাল, বরস আছে, বিয়ে কর একট ।’ সহবেব বলে, ‘তাহলে ভাল খবর দিলি । বাপের বাপও আছে । বড় বাড়ি বেড়োছিল । সৌধন চেরারে বসে চোখ বুলে ভাবছি, বলে কী না ও মাষ্টার লোকে কাজ না করে পরসো নেয়, ভূমি যে ঝুমিরে পরসো নিচ্ছ । তারপর খ্যাক খ্যাক করে হাসি ।’

অটল দাঁড়ায় না ।

বেঁতো জগা মারাত্মক আহত সংবাদ চকাকে আলোড়িত করে দিচ্ছে । ঘর ছিটকে সব বাইরে, কুলির ধারে, সরকারী ইয়ারার পাশে, তেতুলের ছায়ার, ঘর দুয়ারে, বেড়ার পাশে, পাকুড়গাছের নিচে । সব কর্মবাস্ততা যেন স্তম্ভ । সব মৃদু উৎসুক, ব্যাকুলিত সংবাদটার পূর্ণ বাখ্যান শোনার জন্যে । চাঁদ, নেতা, কান্দুর বৌ, আলতা, দেবী, বিনোদ, শরৎমামা, ছেলেমেয়েরা পৰ্ব্ব চোখের তারা বিস্ফারে । সকলেই প্রহ্ন মৃদুর, ‘এই যে অটল, হাসপাতালে নিয়ে গেল ত,’ ‘ভূমি মারামারি দেখলে,’ ‘জ্ঞান আছে,’ ‘চোট লেগেছে কোথায়,’ ‘সাঁতা বেঁচে আছে ত’ ইত্যাদি ইত্যাদি । উত্তরে অটল, ‘বাঁচামরা ভগবান জ্ঞান, ডেক রক্ত বেরিন্ছে, জ্ঞান আছে, উঠতে পারছে না, কে মেরেছে কেমন করে জানব’, বলে আর দাঁড়ায় না । সকালে পাক্সা খেরোছিল । ভাত চাপাতে হবে । রোষ মরে আসছে ।

কাঠের উনুন খড়ের নুড়ো ঘিরে জ্বালিয়ে খেজুর পালি ঘিরে এলুয়ার্নিম্রাসের কালচে হাড়িতে চাল জলে, দুটো গোটা আলু চাপিয়ে, জগার দিদি মালতী হাজির কামার সূর ছড়াতে ছড়াতে । একবারে মড়া কামা, ‘ও আমার ভাইটি তোরা এ কথা কে করলেক, ও অটল কেমন আছে খুঁলে বল’, দীর্ঘ টানে শোকের ধরধরানি । মোটা বেঁটে-খাট মেরেমান্দবের মাথার চুল এলো, মরলা সবুজ পাড় গোলাপী শাড়ী,

ব্রাউস নেই, মেদ বহুলতার মাংস স্তূপের অঙ্গুর ভাঁজ, কোমরে, পেটে, পিঠে বড়ছে । চকাতাই বিরে হয়েছে চরণের সঙ্গে । গোপালপুরে মিস্ত্রিরঘের জমি চষে চরণ । অগ্না বিরে-খা করেনি । দ্বিদির কাছে থাকে । ডাকাত খুনেরা ভাইয়ের জন্যে সবাই সমবে চলে মালতীকে । চটাতে চায় না । গরু সবার নেই, কিন্তু ছাগল মুরগী রয়েছে । লোপাট হয়ে যেতে পারে ।

‘ও অটলবা আমার কাছে খুলে বল । মন মানছে না । বৃক ঝড়ঝড় করছে । মন কু গাইছে । হেই মা কী সন্ধান হল, কোন খালভরা আমার ভাইয়ের এখলা করলেক । মা কালীকে পাঠা বৃব ভাইটি ভালর ভালর ঘর এলে ।’

‘বললম্ ত ভাল আছে । নিয়ে গেল ফনে, আর ধীরে । ডাক্তার দ্বিখাতে ।’

‘তবে যে সব বলছে বেঁচে নাই ।’

‘কে বলছে ? আমি দেখলম্ দ্বিবা জ্ঞান । তবে হ্যাঁ, ঢেক রক্ত— ।’

‘ভাগ্যাস তোমার চোখে পড়ল । ভগমান তোমার ভাল করবে । না দেখলে যে কী হত ।’

‘সাইকেলটি কিন্তু পড়ে আছে পথের গাবার ।’

‘নিভাইয়ের বাপকে পাঠাছি ।’

মালতী যেতে ভূতো । মূনিবাগির করে বেড়ায়, আজ কাজ জোটেনি । ওর বৌ মোড়লঘরের পাটকুড়নি । বৃটো ছেলেমেয়ে । ভূতোর লম্বাপানা মৃথ, ছোট ছোট বৃত চোখ, রোগা চেহারা, গলার স্বর খনখনে, মাতাল মান্দুষ । মধ্য পানের পর দ্বাপানি তার পৌরুষত্ব ফলার বোয়ের কাছে । যার জবাবও পেয়ে যায় । ইটের বধলে পাটকেল । মৃখে শৃধ নয় ওদের কুরুক্ষেত্রে ঢালাকাঠ, খালা, বাটি, কাটা, লাঠি, বৃটি, কাটারির ব্যবহারও হয়ে থাকে । হাঁটুর উপর লৃগ্নি ভোলা, উদ্যোম গা ঝগড়া করার ভক্ত্রীতে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে, ‘তু ভেবেছিচ্ কী অটল, আর কাজ পেল না, শালা আখমরা হয়ে পড়েছিল, তোর ভাত লাগল কিসের, সচান পেরিন্ এলি না কেনে—মরলে লিঠা চুকত ।’

‘আমিও মান্দুষ, উ-ও মান্দুষ । দেখেও চলে আসব ?’

‘মান্দুষ ! কে মান্দুষ বটে, ধেঁতো । ঠেটি কুঁচকে লালচে ছোপ পড়া দাঁত বের করে ভূতো যেন মারতে আসে । খৃখর সঙ্গে খনখনে স্বর ছিটকে দেয়, ‘মান্দুষ লয়, উ একট জ্ঞানোন্নার, সাপ শিরেলের বাড়ী, বহুদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সন্ধান করি বিড়াবে ভাল লৃকের ।’

গিয়েছে কখন কেন । বলে, 'ভেবে দেখ তুমি ।'

'ভাবব আবার কী । জগা রক্তে ভাসাছিল, না বেঁধে দিলে—'

'মরে যেত ।' ফনে শেষ করতে দেয় না, 'ভাগিাস্ তুমি খবর দিলে ।
থাকলে । বুকলে কাকা টাকাট তুমি লিলে পারত । বল তো গামছা এনে
দি কিনে ।'

'না । কিছু ফনে, জগাকে মারলে কে ?'

ফনে বাঁকা চোখে তাকায় । বলে, 'খুঁনে লাভ কী তোমার ?' তারপর সহজ
হয় মুখের রেখা মুছে । ভাস মানুষটার কোন মতলব নেই, নিছকই জানার ইচ্ছে ।
বলে, 'পিছা থেকে না মারলে সে শালাই লাশ হয়ে যেত । দাঁড়াও, জগা একডুং ভাল
হোক, পিতিশোধ লু'ব । কেলে সাপের লেজে পা বিরেছে, বাঁচবে ভেবেছ ।'

'তোরা মারবি ? পিতিশোধ নিবি ।'

অটল পলকহীন । তার রক্তে প্রবল আলোড়ন । সে যেন প্রত্যাক করে, তার
সামনে একটা খুন হয়ে গেল । ধারালো অস্ত্রের আঘাত এসে পড়ল একটা মানুষের
মাথায়, মোরারার মত রক্তধারা ছুটেছে, বিস্ফারিত চোখ, তাঁর আঁত'তে মরণমুখী
এক বীভৎস শব্দ বেরিয়ে আসছে রক্তাশ্রুতের মুখ থেকে । কী ভয়ংকর । অরতর
কাঁপে অটল, ধ্বংস বিস্ফারে স্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ।

'কী হল । যা বাম্বা, তোমার আবার কী হল কাকা ?'

'খুন করিস না ফনে, খুন করিস-না ।' কাতরভায় কণ্ঠস্বরে ভিকার আকৃতি
ফোটে কম্পমান অটলের গলায় ।

'আরে তোমার কী বটে ? লখনা শালো তোমার কে ?' ফনের হাসি নাচে
ঠোঁটে । বলে, 'বল কেউ বটে ? তুমি চেন লখনাকে ?'

মাথা এপাশ-ওপাশ আন্দোলিত করে অটল আতঙ্কে । তার চোখেমুখে ভয়-
শাস । ফ্যাকাশে গলায় বলে, 'মানুষ ত বটে ?'

'জগা মানুষ নয় ?' ফনে কুঁকে থাকে প্রশ্নটা করে পলকহীন দৃষ্টিতে ।

'জগাকে যে মরেছে পাপের হিসেব হবে বৈ কী ।'

'আমরা করব ।'

'না, দেবতা আছেন রে । মানুষ হিসেব করার কে বটে । তার কাছে কারও
ছাড়ান নাই ।'

'দেবতা কী হিসেব করবে । কে ত দেখাই যায় না । সব হিসেব মানুষের

হাতে । সঙ্গ নরক কিছু নাই, যা হবার মাটির পিঁথিমেতেই হবে । তাহালে টাকা লিবে না, গামছাও না ?' বদ'পা হেঁটেই ফনে আবার ফিরল । চাপা গলায় বলল, 'লখনাকে মারার কথা যেন আবার কাউকে বলে বেড়াবে না, মনে রেখ ।' বঁড়াল না ।

কঠিন উক্তার দিন যাচ্ছে । শেষ বিকেলেও দিনতাপ বায়ুমা'ডলে আচ্ছাদন রেখে দেয় । গাছের পাতার নড়াচড়া নেই । শেষ রাতে ঠান্ডা পড়ে, খরার লক্ষণ । চাষের কাজ শূ'রুই হয়নি । এদিকে ঘাসের স'ভাব । শূ'কনো মাটিতে বিবর্ণ সবুজ গালিচা । গ্রীষ্ম কোপে গরু ছাগলের হাড় বের হয়ে যায় । রোদে শেঁকে এসব দর্শিত্তা অটলের মাথায় ঘূর্ণি হয় । এখন ঘরের দাওয়ায় বসে জগার কথার আচ্ছাদন—ভাল হয়ে আবার খুন, চুরি ডাকাতিতে মাতবে, লখনা কে, ওরই মত কেউ, ওর সঙ্গে ২১ টাকা পরসার হিস্যা নিয়ে গোলমাল, না ওদের ঘরে ডাকাতি করেছে ! কোথা লখনার ঘর, কে আছে, ওর মা বাবা বৌ ছেলে মেয়ে নিশ্চয় আছে । জগা তার ক্রটি না করলে মারবে কেন, মেয়ে জগার ক্রটি করল, জগা তার শোধ নেবে, তারপর সে আবার শোধ নেবে জগার উপর—ভাবনার অটল এক ঘূর্ণন দেখে বিশাল চক্রে, যার থেকে ছিটকে আসে রক্ত, যার শব্দে উঠতে থাকে কেবলই আত'নাথ, ষষ্ঠশতাব্দীর প্রবল শ্বাস । অটলের চক্রে ভাঙার প্রবল তাড়না জাগে । বড় অসহায় সে । তার শক্তি নেই, নামধ'্য নেই, প্রতিরোধের কোন বলই নেই, কেবল বিশাল এক ইচ্ছার দিনের আলোর মত ব্যাপ্তি আছে । সহসা তার মনে হয়, জগাকে বাঁচানোর জন্য তো কৃতজ্ঞ জগা, গামছার দাম দিতে চেয়েছিল । হ্যাঁ, সে দাম চাইবে, অন্য দাম । বলবে, 'তুই লখনাকে মারি' না জগা । তাহলেই শোধবোধ । জগা কী কথা রাখবে না ! অটলের মনে হল, গাছের পাতা নড়ছে । আঃ বাতাস ! জোর নেই বাতাসে, ফুরফুরে, গায়ের উপর যেন আঘরের হাত বুলিয়ে যাচ্ছে । ঘরের দাওয়ায় সে বুক ভরে বাতাস গ্রহণ করে ।

ডলি তার হাঁসজোড়া জল থেকে তুলতে পারে না। দিনভর চরেও বুঝি পেট ভরেন। হাঁসের খিদে মেটে না। হাংশ নেই, বেলা নিবছে, আকাশ মাটি আঁধারের আঁচলে ঢুকল বুঝি এবার। আবহাওয়া শেষদুপুরের কালবৈশাখীর দাপটে বদলে গিয়েছে। বুড়ির ফিকে ওড়না উড়েছে, ঝড়েরই তাণ্ডবতা, তবে উচ্চতা মূছে তৃপ্তির শৈত্য এসেছে। তাণ্ডব ফলে গাছের ডাল ভাঙা খড়পাত ওড়া চাল আলগা করে, বিপর্যয়ের একটা ছবি ছড়িয়ে এখন শাস্ত্রী প্রকৃতি। একটু আগে পর্যন্ত মৃদু জলে গা মোচা রোদের চমৎকার ঢলানি ছিল। পালের গরু ঘরে এসেছে, লোকের হাঁস মৃদুগীও, ডলির জোড়াটিই যেন বেরাড়া। না, তুলে নিয়ে গেলে ঘরের কথা মনে থাকে না।

ডলির আটহাতি লালপেড়ে সাধা জমি, না, জমি আর সাধা নেই কাদাগোলা রঙ, শাড়ীটা কোমরে বাঁধা, গ্লাউস খয়েরী, মাথায় উড়ুন্ধ চুল ফুলেফেঁপে, দীঘলও বটে, কুচকুচে কালো। এক ছেলের মা, শরীরেরখায় চামড়ার চিকনতায় শ্রীময়ী যুবতী। উঁচু বুক সাপটে গ্লাউস, ভারী উরু, কাঁধ, বাহু, মূল মাংসল, লাবণ্যময় ঢলঢলে মৃৎখের নাক সামান্য চাপা। স্বামী হারা মারা যেতে মেরেমানদুখের অনেক খামতি ঢাকা পড়েছে। বৈধবোয় শূন্যতার বদলে কুমারী গরিমা ফুটেছে।

‘কোড় কোড় কোড় কোড়’ এবং ‘আয় আয়’ ডাক দিয়ে ডলির মূখে ফেনা ভরে গেল। এখন মাটির ঢিল কুড়িয়েছে। আঁকু গেরস্তর ঘরে বাসন মেজে এল এইমাত্র। ঘরও গোফেন। ঝড় ভলের সময় ওদের ঘরে। চালের অবস্থা কেমন কে জানে। পাতলা করে খড় ছড়িয়ে দিয়ছিল পুরোন চালে। চাঁদা মাঝি ভাল বাড়ুই। ওর হাঘনে ঝড় খড় আলগা করতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাস কী। ঘর গেলে দেখা যাবে। এখন হাঁস হো উঠুক। ছেলটাকে পাশে দাঁড় করিয়ে ঢিল ছোঁড়ে। মেরেলি হাতের দ্বর্বল ঢিল ছুঁড়ে হাঁসজোড়া ঘাট করা বড়ই শক্ত। এখন পুকুরে জলের আয়তন কম, তাতেও পেরে ওঠে না।

ডলির বাপের বাড়ির দূরত্ব চক্রে থেকে বিশ বাইশ কিলোমিটার। হাটা, বাস আবার হাটা। গাঁয়ের নাম কোঁদা। বাপের ঘর মানে মামার ঘর। মামারই

মিলে দিলেছে। পান্থ হিসেবে হারাধনের দাম ছিল। তিন বিঘে বাসদাঁত জমি, অকণা বাইদ ডাঙা জমি, ঘোষেদের ঘরে কিশাণীতে পাঁচ বিঘে, তারপর আধা মিন্দি, চাষ ছাড়া তাতে বাড়তি উপার্জন। সব কাজ জানত, ঘরের দেওয়াল তোলা, কাঠের কাজ, লাঙল বাঁধা, বরজা জানলার টুকটাক সারাই, আধা রাজমিস্ত্রিগারি। ঘরে বসে থাকত না। ডাক ছিল কোন না কোন কাজের। শক্ত সামর্থ্য কালো চোখারা, দাঁত উঁচু, তাতে কী, পুরুষের আবার রূপ, ডলি তো খুশীই ছিল। ওরকম মানদুটা যে মরে বসবে কে জানত। একমাস ভোগাশু, কাঠিসার চোখারা, পাখানা, বমি, ধরাই পড়ল না রোগ। ডলি আমার ঘর যাবার মতলব করছিল প্রথমে। নামাতো ভাই শিবুও শ্রান্ত এসে প্রস্তাব দিয়েছিল, আমার ওখানে চল। ভিটের একদিকে জায়গা দেব। তখন মনে হয়েছিল, সেই ভাল। কদিন গিয়ে থেকেও এল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল চকাতাই থাকবে। ছেলেকে মানদু করবে। শিবু তো আর ভাত দেবে না, তাকেই জোগাড় করে নিতে হবে। শিবুর ঘরে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সাত জন, হা হা দৈ দৈ লেগেই থাকে।

ডলি সাঙা করতে পারে, বয়স আছে, জীবনের অনেকখানি সামনে পড়ে। বেঁচে থাকার ফেরুকু মাধুর্ষ সে তো এই শিশুপদ্যটি। কিন্তু নারী হৃদয়ের পুরুষ তো শিশু একক নয়। শরীরের ধর্ম আছে, পুরুষের আসঙ্গ লিংসার কামনা আছে। বাড়িডিসমাজে সাঙা, নারীর দ্বিতীয় বিবাহ প্রচলিত, নিয়ম অধীন। ডলিতে আকর্ষিত পুরুষ যে নেই এমন কথাও নয়। প্রস্তাবও এসেছে। ন'কোশের মেয়ে অটুর বৌ বলেছে, তার ভাই হরিদাসের বৌ মরেছে, রাজি থাকলে ডলি, কথা পাড়ে। হরিদাসের খুবই পছন্দ ডলিকে। বোনের ঘর আসে প্রায়ই। ফনে বয়সে তার চেয়ে ছোটই হবে, ইদানীং তার উপর বড় প্রেমপ্রবণ হয়ে উঠেছে। চোখেমুখে ওর লালসা টের পায় ডলি। আলতামাসী বলেছে, ওর ভাইপো খজুর কথা। সাঁইথরার ধানমিলের লরির খালাসী, ভাল রোজগার। কাস্ত ও সাঙাতে রাজি, ছোটবোয়ের কথা। তারপর এখন হয়েছে অটল। না অটলের সাড়া নেই। কথাটা জেঠীর। ওই নামটাতেই ডলির যা বিচলিতভাব। সুপুরুষ নয়, উপার্জনও খুবই কম, তবু কোথায় যেন আকর্ষণ আলোকচ্ছটার ধ্যেয়ে আসে। ভালমানুষের মন্থেচোখে দীপ্তি, হাসিতে সঙ্গলতা, চুরি বাটপাড়ি অন্যায় নেই, নারীঘটিত দোষ নেই, তার দিকে চাউনিতেও বৈধব্যের জন্যে নিপাট মায়া শূন্য। কিন্তু তার মনে পুরুষটির ছায়া কী বৈধব্যের পরে, জেঠীর কাছে শূন্যে, তার আগে নয়? অটলের বৌ চিনি তার বন্ধু ছিল, ও ঘরে কত গল্প করে এসেছে, সে তো দেখতে পেত সবই। তারও

তো স্বামী ছিল, হু' বেলা অন্ন, মোটা কাপড়. নিশিকালে শরীর স্খাদ, কিন্তু চিনির উপর অটলের যে ভালবাসা দেখেছে তার ছিটেফোটাও তো ছিল না। ঈর্ষা হত চিনির সৌভাগ্যে। জেঠীর কাছে শোনাতক্ শরীর কাঁপে, রক্তধারা কামতাপ পেরে স্নান আঁক, প্রারণা ভাবনার ওই পদার্থ, রাস্তার দেখা হলে তার চাউনিতে কুমারী লজ্জা নামে।

ডাল আশপাশে তাকায়। ওঁদিকে যেতে হবে, জলে নামতে হবে, আচ্ছা বে-আক্কেলে হাঁসদুটো। এদিকে সূর্যডোবা বেলা ফিকে কালি ছুঁড়ছে, ঘন হয়ে উঠবে একুনি। পাখিদের জোর হল্লা ওঁদিকের বাঁশঝাড়। পাড় ধরে আসছে কাস্ত, না ডাকবে না। অটল হলে ডাকত। ভাবনামাত্র অটলকে আসতে দেখে। ডাল নিজের কাছে নিজেই আশ্চর্য। পাশ ঘেঁষে পেরিয়ে বাবার আগেই ডাকে, 'শুনছ !'

অটল দাঁড়িয়ে পড়ে।

'হাঁসদুটো একটু তুলে দাও দেখিনি—পারছি না।'

'উঠছে না কেনে উরা?'

ডাল হাসে। ভালমানুষ হ'ল বোকাও বটে। না ওঠার কারণ ডাল জানবে কী করে। হাঁসদের পাক পাক ভাবার মানে জানলে না হয় জিজ্ঞাসা করত। বলে, 'ভূমিই শূন্যেও হাঁসকে।'

ডাল চোখের রেখায় হাসির সঙ্গে আরও গভীর কী যেন আঁকে, যা অটলের হৃৎপিণ্ড বরাবর তীক্ষ্ণ ফলকে বিস্ত হয়। পড়ন্তবেলায় এলোচুলে মেরেমান্দু বড় বিক্রম সৃষ্টি করে, আকর্ষণ হয়ে ওঠে মোহিনী জাল। চোখ, ঠোঁট, চিবুক, কণ্ঠ, স্তনধর, কোমরের খাঁজ, শাড়ির আবারিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শব্দময়তায় ভরে ওঠে। তখনই যেন তার বৌ চিনি রূপ পায়, অন্য শরীরে তার প্রতিচ্ছা ঘটে। মূহুর্তে ডাল চিনি। অমনই মাটি ঠেলে, গাছপালা প্রচণ্ড বেগে নাড়া খায়, বেগবান বাতাস ভাসিয়ে আনে অজস্র ঝড়কুটো, ভূকম্পন অনুভূত শরীর সব আবেগ উৎসর্গের জন্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে চায়। চিনির অনুচ্চার ঠোঁটে মৃত্যু উত্তীর্ণতার জয়হর্ষ। গাঢ় অভিমান আত্মকণ্ঠে বলতে ইচ্ছে করে, 'চিনি তুই। চিনিরে—।'

'কী দেখছ অমন করে, ভূত নাকি আমি। চোখ ফেটে পড়ছে, নাকের পাটা ফুলছে। হেই মা কী হল তোমার।' মেরেমান্দু মাথার চুল সরায়, হাসে। শরীরের সব এক ভাঙচুর ঘটিয়ে ঘন হয়।

অটল অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, দ্রুত পদকূর গাবার নামে। জলের ধার ঘেঁষে মূখের শব্দ আর মাটির ঢেলা ছুঁড়ে হাঁসজোড়া ঘাটে আনে। বিরক্তির প্যাকপ্যাকনি নিয়ে

হাঁস ঘরের পথ করতে বলে, 'বাও, নিয়ে যাও ।'

'ও ঠিক চলে যাবে । ভাগ্যিস তুমি এলে । কোথা যাবে ?'

'একটু এঁড়ে খুঁজে পেছি না পিসির । ঝড় জলে কোথা যে গেল ।'

ডলির দৃষ্টিতে চোখ সরিয়ে নেন অটল । 'কিছু কী বলবে ? তার দেখাটা কী অমন করে ঠিক হয়নি ? কী করবে, ও যে চিনি হয়ে গিয়েছিল একটু আগে ! বেন অপরাধ হয়ে গিয়েছে, সেটা ঢাকা দেবার প্রবণতাতেই বলে, 'তোমাকে আজকাল একদম দেখতে পাই না ।'

'দেখার চোখ আছে তোমার !' ডলি হাত দিয়ে কপালের চুল সরায় । তার স্মরণ এবং চোখমুখ রমণীর আয়ত্ন হয়, ধারালো হয় হাসির উজ্জ্বলতার । বলে, 'দেখার জন্যে মন দিতে হয় তাহলেই চোখে আসে ।'

'শুনছিলম বাপের ঘর যাবে !'

'মরতে যাব । চক্কাই ভাল ।'

'তোমার হাঁস চলে গেল ।'

'ঠিক ঘরে যাবে উরা । উদের ভুল হয় না ।'

'দেখি এঁড়ে কোথায় গেল !' অটল এগিয়ে যায় ।

'পাকুড়তলা দেখ গা । সাধা পারা বটে ত । আর শোন, খবর লিও । বোঁ নাই, তোমার ঘর তাই যাই না । তোমার ত খবর লিখা বটে !'

'তা বটে । হারাও তো নাই ।'

'তাতে কী । তুমি যাবে । আমি কাউকে ডরাই না ।'

অটল বলে, 'যাব এখন ।'

'উ'হু, আজই গরু চুকিয়ে এস । আমি ঘরে রইছি । যাবে ত ? কথা আছে ।'

অটলকে বলতেই হয়, 'যাব ।' সে ভেবে পায় না কী কথা ! ভয় করে তার । এ ভো চিনি নর, ডলি, অন্য মেরেমানুষ । বাছুরটাকে খুঁজতে সে এখন হনহনিরে হাঁটতে শুরুর করে । পিছন ফিরেও দেখে না ।

ঘরে এসে হাঁস ঢোকায় ডলি । দাওয়ার একধারে কাঠের উনুন । মাটির দোতালার ঘরের ওপাশে গোয়ালের চালা । বলদ নেই । একটা বকনা ছিল, তাও মারা পড়ল অসুখে । এখন দু'টো ছাগল । উনুনের পাশে কাঠকুটোর সব জলের ছিটে লেগেছে । ঘরের চাল কিছু হয়নি বটে, কিন্তু উঠোন দাওয়া খড়কুটো, পাতা, ধুলো বালিতে ভরে আছে । ঝটি দিতে হবে । কাঠা বেড়েক উঠোনে একটা বড়সড় আমড়া গাছ, তিনটে মাঝার সবুজ ঝটি নিয়ে ইউক্যালিপটাস, ওদের কিছু হয়নি ।

ঘর উঠোন ঝটি দ্বিহে ডাল চা চাপায়, ছেলেকে বাটিতে করে মড়ি খেতে দেয় ।
বাওয়ার একটা নষ্টা পেতে রাখে । অটল যখন কথা দ্বিহেছে আসবেই । একটা মন্দের
সন্ধাননা তার মধ্যে বাজনা বাজায় ।

অটল আসে । সন্ধানর আল নেমেছে । অস্পষ্ট সব কিছু । লক্ষটা ছালাতে
হবে । এখন কাঠ গোঁজা উননের আলো আভা শব্দ ছড়ান । গারের কাপড় ডাল
ঠিকঠাক করে নিয়ে অস্তরঙ্গ স্বরপাতে বলে, ‘বস ।’

অটল বসে বলে, ‘কী কথা যেন আছে ।’

‘আছে । বস, চা খাও, বলছি ।’

‘স্বাবার চা কিসের লেগে ।’ অটল ছেলেটাকে দেখে, ‘বেশ রোগা লাগছে ।’

‘দেখ কেনে, ভুগছে । গোকুল ডান্ডারের ওষুধের কামাই নাই, তবু ।’

‘কী সন্দের চেহারা ছিল ছ’ সাত মাসের সময় ।’

ডাল উত্তর দেয় না । চারের কাপ নামিয়ে দ্বিহে লক্ষ ছালে । তারপর
হারিকেন এনে কাঁচ মূছে ধরায় । লক্ষটা নিবিয়ে হারিকেন রেখে দরজার পাশে
দাঁড়ায় । বলে, ‘জগাকে কেনে বাঁচালে তুমি ! তুমার মত মানুষ সব জেনেশুনে— ।’

ডালর কথা সম্পূর্ণ শোনার দরকার নেই । একই কথা নানা মূখে চকার,
গোপালপুড়ে । যেন সে একটা মহা অন্যায় করে ফেলেছে । কিন্তু এত লোক যখন
জগার বিরুদ্ধে তখন জগা কুর্কম করার সাহস পায় কী করে ! সকলে তো প্রতিরোধ
করতে পারে । অটল ভাবে, এই তাহলে ডালর কথা ।

‘কী, হল । মূখে রা নাই ।’

‘বাঁচানো কি মারার মালিক আমি লই ।’

‘হেতু ত ষট । খপর না দিলে মরে কাঠ হয়ে থাকত ।’

‘আমি না দিলেও অন্য কেউ দিত, যে আসত ও পথে সেই-ই ।’

এমন মেৎকার নারী যার চোখ মায়াঘন শরীরেখা স্নিগ্ধতা ছড়ায়, কণ্ঠস্বর ক্রান্তি
মোছে, যে নারী সন্তানের জন্ম দেয়, পালন করে মমতায়, সংসার গড়ে ভালবাসা স্নেহ
প্রেমপ্রীতিতে, তার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে এমন নিষ্ঠুরতা, কোন ক্রোধে এমন
ভয়ঙ্করী দানবী ! অটলের স্থির চোখে তারই বিস্ময় আঁকা হয় । না, মানুষের
অস্তর রহস্য অদৃশ্য, বুদ্ধের জটিলতা চাক্ষুষ হয় না । সে উন্মিতা নিয়ে প্রশ্ন করে,
‘কী বলছ । এত রাগ কেনে তোমার ।’

‘সোনায় বাপকে ওই তো খুন করেছে ।’

শোনামাত্র শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে অটলের, ‘বল কী ! হারাদাকে ও খুন করেছে ।’

‘হ্যাঁ, মরে বিষ মিশিয়ে । তার জন্যে ওষুধে কাজ হয় নাই, রোগ ধরা যায় নাই । অল্প অল্প হেগে বমি করে মানুষট চলে গেল । কোন পেমান নাই যে ধরি । একা মেয়েমানুষ করব কী !’ হতাশার স্বর ছড়িয়ে ডাল বলে, ‘মানুষটাই চলে গেল ।’

‘মারল কেনে ?’

‘ক দিন খুব স্যাঙাত হয়েছিল । একসঙ্গে মদ খেত, চুরিচামারিতে বেত । টাকা পয়সার ভাগ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ।’

‘তুমি আটক দিতে পার নাই ?’

মাথা নাড়া দেয় ডাল, ‘না, সাধি কী ! মানুষকে মরণ ডাকলে কানে কুন্দ কথা যায় না ।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ‘ফনে বলতে জানলাম ।’

‘ফনে ত জগাএই দলে থাকে ।’

‘তাতে কী । সব আপন আপন । দল বল আর যাই বল, স্বাখে লাগলে সব ফোস করে । ফনে আমাকে মজাতে চায় । আমার লেগে রাতে ঘুম হয় না । সাঁঝবেলায় আমার কাছে এসে উঠতে চায় না । আমার সঙ্গে শুলে শেতল হবে ।’ পরম ধোঁতুকের হাসি আবছায়ায় ডাল টানা বলে যায়, ‘আমার দুঃখে ওর প্রাণ কাঁদে । জগা নদে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, ওই তো বলেছে । ও নাকি বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, বলোঁছিল এমন কাজ করা না, জগা শূনে নাই ।’

‘পাপ করেছে জগা, মহাপাপ ।’

‘তার শাস্তি পেয়েছিল, তুমি বাঁচালে । লখনাকেও বলিহারি, শ্যাব করল না ।’

‘লখনা মেরেছে তাহালে । ফনেও বলছিল ।’

‘আমারও ওরই কাছে শোনা । ছাড় তো, জগার শত্রুর অভাব ! চা খাও ।’

চায়ের কাপে চুমুক দেয় অটল । বলে, ‘গাঁয়ে কত কী হচ্ছে, কিছুই জানি না । জেনেই বা কী হবে । আমি কীই বা করতে পারি ।’

‘তাহালে বোঝ, তুমি বেটাছেলে বলছ কী করতে পারি । আমি তো মেয়ে—’ সামান্য থেমে কাঠিন্য এনে বলে, ‘তবে পারব ।’

‘কী পারবে ?’

‘বাঃ, ফনে আমার পিরীতের পুরুষ । আমার অঙ্গ দুলদুলিতে নাচছে । নাচলে কত কী হয় ।’ নাচাতে পারলে কত কী করানো যায় ।

অটল ভব্দ বোকাটে প্রশ্ন করে, ‘কী !’

‘কেনে জগাকে খুন ।’ চাপা গলায় বলে উনুনের ওঁদিকে যায় ডাল ।

অটল চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে । ভন্ন-হাসের ঘন ঝোড়ো মেঘ অন্তর বাহির

আবৃত করে। সে প্রত্যক্ষ করে মৃত্যুর একটা রক্তাক্ত মালা ঘোলা খেয়ে খেয়ে ফিরছে।
 নরমুণ্ড মালায় একের সঙ্গে অন্যের রক্তসূত্র বন্ধন। লখনা, হারাধা, জগা, ফনে, ডলি
 আরও কত মৃদু। প্রতিশোধ স্পাহার রক্ত জিহবার তব্দ হাঁ মৃদু, তব্দ পিপাসা।
 দাওয়ার সে যেন অশ্বকারে ভিজে চুপসে থাকে। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়েছে ডলি, কাঠ
 গুঁজে দিচ্ছে, তারই রক্তিম আভা লুটিয়ে পড়ছে দাওয়ার, লাফ মেরে ডলির অঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গকে চিনিয়ে দিচ্ছে খোঁচা দিয়ে। জগাকে বাঁচানোর আকস্মিক জড়িত হয়ে পড়ান,
 বিবিধ মন্তব্যে বিরক্তি লাগলেও, সে নিজস্ব মতে স্থির ছিল, সে মানুষের কর্তব্য
 করেছে, ধর্মের চোখে সে নিষ্পাপ, কিন্তু এখন প্রশ্ন জাগে, সত্যি কী তাই,
 নিষ্ঠুর, খুনী, শয়তানকে বাঁচিয়ে রাখার সহায়তা কী পাপ নয়? তারপর ডলি
 বলছে। হারাধার এই বিধবা অশ্বকারের মধ্যে রহস্য ছাঁড়িয়ে দিয়েছে তার চারপাশে,
 এমন ব্যবহার, এমন চাউনি, এমন ভঙ্গী, নিশেবে রচনা করছে শৃঙ্খল, সে ঠের পাছে
 চমককার এক মাধুরিমা। পুকুর ঘাটে হঠাৎ চিনি হয়ে ওঠা ডলি, এখন ডালিই, তব্দ
 রক্তের মধ্যে কণিণ এক কানাতুর সুর বয়ে যাচ্ছে।

‘জুদুছ!’ ডলি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেয়েমানুষ। স্বর বদল ঘটিয়ে যেন অটলের স্পর্শ
 পেতে চায়। বলে, ‘আমি একা থাক, তুমি তো খবর নিতে পার।’

‘তা পারি।’

‘তাহলে আস না কেনে?’ আভ্যানে ভেঙ্গে ডলির কথা।

অটল বলে, ‘আবার আসব। খবর লব।’

ওদিক থেকে ধানাইয়ের বড় মেয়ে আসে। বছর চোদ্দ বয়স, ফুকপরা রোগা
 কালো চেহারা। বলে, ‘কাকা তুমি!’

‘এই এসেছিলাম। তু কি বলছিছ?’

‘জ্যেষ্ঠীর কাছে এসেছি। ও জ্যেষ্ঠী, মা বললেক, দুটো কাঁচালুকা দিতে—আছে।’

ডলি বলল, ‘আছে। দাঁড়া দিছি।’

অটল, ‘আমি তা হলে যাচ্ছি’ বলে বেরিয়ে আসে। অশ্বকারে হাঁটা অভ্যাস
 আছে। বাঁশঝাড়ের পাশেই চণ্ডীর ঘর, আর একটু এগিয়ে ফনের আভা দাশুর
 ঘরে। সারা চক্কা আধারে টুপি পরে নিয়েছে। শব্দও নেই। আলোর লালচে
 আভা দু’ একটা ঘরের বাইরে পড়েছে। একটা টর্চ যাচ্ছে আগে।

‘কে বটে?’

‘অটল বাঁটা।’

‘অম্বারে খালা কিছু ঠাণ্ড হর না। গেইছিলে কুখার?’ মদের গন্ধময় বাতাস

বেরিয়ে আসে প্রতিটি কথার ।

স্বরেই অটল টের পার ভূতো । গলা অস্থি ভেতো গিলে এল গোপালপুরের
দেশী মন্দের বোকান থেকে । বলে, 'ওই হারাধার ঘরে ।'

'বাঃ শালা, হারা নাই, মাগী একা, সাঁঝবেলা ।' কথার ঢেউ ভূতোর কৌতুক ।
মেরেমান্দুষ সংক্রান্ত রসালো যৌন অন্তর্ভূতি থেকে যার উল্লেখ । মদো গম্ব বাতাসে
ছড়ানোর সঙ্গে বলে, 'তা কতদিন থেকে এসব চলছে ।'

'চলছে আবার কী । দরকার ছিল । মান্দুষ মান্দুষের ঘর যাবে না ?'

'মেরেমান্দুষের ঘর বল । মেরেমান্দুষের ঘরে যত দরকার লাগে তত ভাল ।'

'ঘর যাও । মদ আর ছাড়তে পারলে না ।'

'কোন দৃশ্যে ছাড়ব চাঁদ । আর ঘর যাব না তো কী ধাঁড়ান থাকবে ? মদ
খাই নিজের পরসায় । আমি শালা কাউকে ডরাই না । কুন শালা আমাকে—।'

মন্দের নেশার বকার যৌক আসে উল্টোপাল্টা । ধাঁড়িয়ে শোনা বোকামি ।

'এই শোন, শালা ভালমান্দুষ, জগা এসেছে ।'

অটল উত্তর দেয় না ।

'তুই তো শালা বাঁচালি, এবার আমার মাগ সেবা করুক ।' ভূতো বলার পরই
হাউ হাউ করে কাদতে শুরু করে ।

অটল থামে না । চকার কোন শব্দ নেই । শব্দ ভূতোর কান্নার শব্দ পিছন
থেকে ছুটে আসছে । ক্রমে ক্ষীণ হচ্ছে । আকাশ অবিরল অন্ধকার ঢেলে যাচ্ছে ।
নক্ষত্র ফুটেছে মাথার উপর টাঙানো কালো চাদরের বুক । অটল ভাবে, তাহলে
জগা এসেছে । চকার আবর্তনচক্রে আবার তার ভূমিকা । ঔষধতাপূর্ণ, নিষ্ঠুর
স্বাতক স্বভাবী, ক্রান্তিকারক । কিছু সে কী করতে পারে । মান্দুষ কাজকর্ম করুক,
খেটেখুটে শাস্তিতে জীবন চালাক, সবাই অন্ন পাক, পরস্পরকে দেখুক, জীবনের
ছোট পরিধিটা সুন্দর হোক, তার কামনাই তো মনে থাকে । জগাকে বাঁচানোটা সম্ভব
না অসম্ভব হয়েছে, ঝলুটা আবার ফোড় দেয় । ভাবে, সে বাঁচিয়েছে, সে যদি না
বাঁচাত, রক্তপাতে মৃত্যু ঘটতে পারত আবার নাও পারত, অন্য কারও চোখেও পড়তে
পারত এবং সেই মান্দুষটা তারমতই কাজ করত, মৃত্যুকাতর মান্দুষকে বাঁচানোর
প্রবণতার কোন বৃদ্ধি বিচারই বিপক্ষে গ্রাহ্য হয় না । তবে যা হয়েছে, হয়েছে ।
অটল কোনক্রমেই জড়াবে না । ডলির প্রতিশোধস্পৃহা লগনা-জগা স্বপ্ন এবং আগামী
অবসানের ভরস্করতা সে অনুভব করতে পারছে ।

ফনে রাত্তার ধরল, 'জগা তোমাকে ডেকেছে।'

'কিসের লেগে?'

'আমি তার কী জানি। পার ত এখন যাও।'

অটল উকর দেখে না। ফনে দাঁড়ায় না। অটল ভাবে, ডাকুক, সে যাবে না। গেলেই সম্পর্ক, গেলেই আবার জড়িয়ে যাওয়া। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, টাকাটা হয়ে দিতে চাইবে। শব্দ আজ নয়, কাল-পরশ্বত সে দেখা করবে না, পথে দেখা হলেও নিরুৎসাহ সে পরিহার করবে পাপসঙ্গ। জগাকে এখন সে ভয় পায়।

সেইতো জগা নিজেই অটলের কাছে এসে। পাক্সমার উপর কলারওয়ালা নীল গোল, মাথায় খামুণ্ডের ময়লা কাপড়, রক্ত খয়েরী চুল, ঈষৎ রোগা, জ্বরাক্রান্ত চেহারা, পায়ের নতুন হাওয়াই চম্পল। উঠানে দাঁড়িয়ে সিগারেটে শেষ টান ধরে ঝুঁকুরো মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে বলল, 'ঘরেই রয়েছ অটলদা। আরে খবরও নাও নাই আমার।'

অটল ঘর ভেতর, জগাকে নিয়ে কোন কথা কেউ বলেওনি। চক্কর জগার চিকিৎসার পর প্রত্যাবর্তন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, সংবাদ নয়, ওর থাকা না থাকা সমান, হাঁসচুরি, ছাগলচুরি কিংবা কাউকে মারধোর করলে কথা হয় শব্দ। ফনে হতে যাচ্ছিল সাময়িক আলোড়ন তুলেছে, মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে এসেছে এতো অতি সাধারণ কথা। সকলেরই অলসসংস্থানের জন্যে ছোটোছোটো, রক্ত ঝুঁকিয়ে আকাশ দেবতার অনুরোধ বারিধারায় নামেনি, কাল বাড়-জলের সামান্যতায় পাপসাত্ত্ব মাটি ঢৌক গিলেছে মাত্র, আবার হা-জল। গোবর, খড়পাত সার গাড়িতে যাচ্ছে মাঠে ফেলতে, ঝিরের কাজ করতে ছুঁতে মেয়েবো, চাবজাল নিয়ে খালে ডোবার মাছ ধরতে বেরিয়েছে কেউ কেউ, হাঁস-মুরগী চরেছে, ছাগল গরু চরেছে, ন্যাংটো কী আধ-ন্যাংটো বালক-বালিকারা খেলার ব্যস্ত, চক্কো তার নিজস্ব আবেগিত চিত্রে।

অটল গোপালপুত্র যাবার আয়োজন করছিল। দু'ঘরে গাই দুইয়ে গরু খুলবে। চায়ের বাটি ধুয়ে ঘরে রেখে উঠানের দিকে ঘাড় তো ফেরাতেই জগা। সকালের আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে প্রত্যক্ষ সে করতে চার শয়তানের কোন চিহ্ন জগার মধ্যে আঁকা হয়ে আছে। সেইতো মানুষের মদ্য, কপাল, হু-রেখা, নাক, ঠোঁট, চিবুক, ঘাড়, হাত, পায়ের পাতা। গায়ে কতদিন থেকেই তো দেখেছে। গোপালপুত্র

ঘর হলেও চক্কাই ওর ঘর। ঘিঘির ঘরেই বেশ সময় থাকত। ওর বাবা ভগ্নায়ত্বেও অটল চিন্ত। রোগা ঢাঙা মানুস। ভাল মানুসই ছিল। কোন বদনাম শোনেনি। কিসাণী করত। বেচারি আষাঢ় মাসে লাঙল মারতে গিয়ে বাজ খেল। জগার তখন মালতীর ঘরে আশ্রয়। অটলের জগাকে দেখা তখন থেকেই। বরষে তার চেয়ে ঢের ছোটটিকে গায়ের আর পাঁচটার সঙ্গে একই মনে হত। যা হোক ঘিঘি আর কত ভাত দেয়। শিবপদুর বাসস্ট্যান্ডে জটুর চায়ের দোকানে লাগিয়ে দিয়েছিল। গ্রাস খুত, ঝাঁটপটি দিত, জটুর ঘরের কাজও করে দিত পেটভাতায়। ওই মোড়ের চায়ের দোকানে থেকেই ছেলেটা চালাকচতুর হয়ে উঠল। একদিন দেখা গেল রিক্সা চালাচ্ছে। রিক্সাটা লাহাবাবুদের। মাটির সড়কে আশেপাশের গায়ে যায় বাহী নিয়ে। কিন্তু খুব বেশিদিন রিক্সা চালায়নি। হঠাৎই একদিন জগার খোঁজে চক্কর পদলিশের জিপ। জগা নাকি সীতে বাড়ির ডাকাত দলে আছে। খব্বনার সাহা ঘরে ডাকাতিতে ছিল। চক্কর এসংবাদ খুবই আলোড়ন তুলেছিল। সীতে বাড়ির নাম সবাই জানে। পাশেই বিহার বাড়ার। সীতে বিহারের রানীশ্বরে থাকে। তবে বেঙ্গল বিহার ডাকাতির ক্ষেত্র তার সবই। কিন্তু জগা গিয়েছে ওর দলে—এ তো সাংঘাতিক সংবাদ চক্কর মানুষের কাছে। গুজ্জন, আতঙ্ক, সর্বত্র ওই আলোচনা। চক্কর সবাই হা-অন্নের প্রজা। প্রায় সময়ই ঘরের হাঁড়ি টুঁ টুঁ। সন্ধ্যোগ পেলে গোপালপুরে কী ক্ষেত-খামারে ছোটখাট চুরিচামারি যে করে না, এমন নয়, কিন্তু ডাকাতি! পদলিশের ভুল হয়েছে, এটাও ঠিক নয়। জগা গায়ে এসে সবসঙ্গে ঘোষণা করল, সীতে বাড়ির দলে সে আছে, শালা পদলিশ কী করবে। বছরতিনেক আগের এই ঘটনা অটলকে কতটা ভাবিয়েছিল মনে নেই। জগার চেহারা, জামাকাপড়, হাবভাব, ঔজ্জ্বল্য গায়ে হাস-মুগুগী ছাগল চুরি, ছেলেটা মহা অধর্ম করছে এমন ভাবনারাও সীমাবদ্ধ ছিল, তেমন কিছু পীড়াদায়ক মনে হয়নি। এখন তার স্থির নেত্রপাতে মন্ত্রণা আচ্ছন্নতা আসে বৃকে। ভালমানুষের ছেলের সব পাপ ধোত করার আকুলতা জাগে।

‘আরে হাঁ করে কী দেখছ, আমি জগা—মরি নাই।’

অটল বলল, ‘আহা মরবি কিসের লেগে।’

‘তুমি গামছার দামট লাও নাই অটলদা।’

‘পদুরোন ছেঁড়া গামছা, দাম কিসের। লাগবে না।’

‘মরেই যেতম তুমি না থাকলে।’

অটল ভাবে, জগাকে কি বলবে তার মৃত্যুকামনা করে সকলে। বলবে, জগা পাপের পথ থেকে সরে আস, অধর্ম করিস না, খেটেখুটে খা, সংসার কর, এই আশাত

থেকে ছেতনার ফের। টেট নড়ে না, পুঁকুখো ঘরে তার সকালের আলো প্লাবন।
 চক্কানি আছে, জলদান নেই। আকাশ শূন্য মাঠের মত পড়ে আছে সুবের পথ
 পরিষ্কার করে। হাওয়ার মাথুর্ষ। তবে কতক্ষণ। এরপর তাপমাত্রা বেড়েই চলেবে।
 দু'টো ছাগল দাওয়ার কাছে। স্থলপশ্ম গাছটার বসে আছে নীরব বিষম একটা কাক।
 চুইয়ের ছটকটানি তার খড়ো চালের মধ্যকার বাসা থেকে উঠোন, আশপাশে।
 ডোবার ধার ঘেঁষে রাস্তাটার একটা সাধা গাই বেরিয়ে গেল—গোপলাদের বটে।

‘বুঝলে, ভাগ্যিস তুমি আসিছিলে। লাও, সিগারেট ধর।’

‘আকেমখো বিড়ি খাই, সিগারেটে পুঁবার না।’

‘আরে খাও দেখি।’ প্যাকেট বাড়িয়ে দেয়, ‘আটটা আছে রেখে দাও—খাবে।’

অটল ঘাড় নাড়ে, ‘আনাকে গাই বুইতে যেতে হবে।’

‘যাবে এখন।’

‘বাছুর হামলাবে। সারারাত মারের দৃশ্য পায় নাই।’

‘হামলাক। তোমার বড় মারা, অত মারা ভাল নয়, বুঝেছ।’

অটল মনে মনে বলে, ঠিকই তো। নইলে তোকে বাঁচাতে রাই জগা। বলে,
 ‘মানবের মারা থাকবে না এ কেমন কথা জগা। তার জন্যেই তোর কষ্ট।’

‘কষ্ট! আমার কিসের কষ্ট। কষ্ট তো তোমাদের মত ভালমানুষদের। বুঝলে
 শূন্যরাতে ভালমানুষরাই কষ্ট পায়। বাবার মাথাতে বাজ পড়ে, তা বাদে জুই
 আমাকে খাটিয়ে পেটপূরে খেতে দেয় না, রিক্সা টানাতে বলে, চুরি করছি, লাহাদের
 ঘরে কীসার থালা চুরি গেল, কী না আমি নিয়ে এসেছি লুণ্ঠিতে গুলিয়ে, কত বলব।
 এখন শালো কেয়ার করি না।’

‘তোকে লখনা মারল কেন?’

মুহুর্তে চমকানি জগার। চক্কানি হটকে আসতে চায়, ‘তুমি দেখেছ? ওই
 শালাই বটে নয়—ওই শালাই।’

‘উঁহু। লখনাকে আমি চিনিই না।’

উত্তেজনায় একেবারে বকের কাছে জগা সরে আসে, ‘লখনা, বেশ ভাল চেহারা।’

‘আমি কাউকেই দেখি নাই।’

‘তাহলে লখনা মেরেছে জানলে কেমন করে?’

‘শূন্য কথা। কিন্তু ঝগড়া কিসের?’

জগা শান্তজলার বলল, ‘ওর এক জোড়া মোষ মাঠ থেকে চুরি হয়েছে। থানাতে
 শালা আমার নামে ডায়েরি করে এসেছে।’

‘একজোড়া মোষ, ঘাম ত ঢেক বটে ।’

জগা যেন শোনে না, সন্কোভে স্বলম্ব চোখ আগুন ঠিকরায়, ‘শালা পিছা থেকে
মারল । বাপের বেটা হলে সামনে আর ।’

‘মোষ তুই চুরি করিস নাই ?’

‘করেছি ।’ সদপে ‘যেন জগা ঘোষণা করে মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে, হাসে ।
সিগারেট ধরায়, ধোঁয়া ছাড়ে, ‘কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ কে চোর ।
শালো প্রমাণ করুক ।’ যেন কৌতুক, মোনায়েম স্বরপাত, অহংকারের স্ফুট বদবদ,
ওঠে ভাঙে, ছড়িয়ে যায় ।

‘কিন্তু তুই তো নিজে জানিস্ ।’

‘তো কী !’ জগা শব্দ করে হাসে ।

‘তোরা ভয় করে না পাপকে ?’

‘পাপ ! সে আবার কী ! সে তো তোনাদের মত ভালমানুষদের ডর দেখানোর
চনা গো অটলদা ।’

শুশ হয়ে যায় অটল । বৃকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ বাজে । ভয়ের অনুভূতি
নখাগ্র থেকে মস্তক অবধি আবৃত করে, ‘জগা আমার কাজ আছে ।’

‘আহা বাবে এখন । যে জনো এলম তাই বলা হল না ।’

অটল নির্বাক আঁখি ফেলে রাখে ।

‘শোন গামছার পরসা নিলে না, সিগ্রেটও না । কিন্তু তোনার উপকার কিছু না
হলে পারলে আমার শাস্তি নাই । তুমি কণ্ঠে আছ ।’

‘কে বলেছে । দ্বিবি আছি ।

‘ধুং ওই তো গরুবাগালির পরসা । তোমার টাকার দরকার নাই ?’

মনে পড়ে যায় অটলের ছিদামের বৌকে শোধ দেবার কথাটা । বলেই ফেলে ।

জগা খুশী হয়, ‘দেখলে তো ! এই যে লখনার মোষবদুটো চালান দিতে হল ।
থানা থেকে মেজবাবু খবর দিলে, ওর শালার বিয়ে । দু’ হাজার আড়াই হাজার
খরচা । জগা দে । সদরী তো ভাগলপুঁর জেলে পচছে । খুন ডাকাতিতে, এ
জন্মে ছাড়া যাবে না । দল ভেঙেছে, বড় শিকার নাই অথচ টাকা দিতে হবে থানায় ।
যাক্ গো । ছাড়, কিন্তু ছিদাম তো ফট্ । বৌও থাকে না ।’

‘তাতে কী ! ওর বৌও থাকে না । দেনার কথা জানে না, তাতেই-বা কী বটে ।
-খস্ম নাই, খস্ম জানে না ।’

জগার মাথার ব্যথাটা আছে । কেমন যেন তার ভারটার উপর মানুষটার ভাবনা

কেন আরও ভার চাপিয়ে দেয়, কতটা ভাগে। ধর্ম। ধর্ম কী, কাকে বলে, কে সে ?
কেন নতুন কোন শব্দ, অসম্ভব শক্তি ধারক অস্তিত্ব নিয়ে সজাগ হয়ে উঠে আঘাত হানে,
বাকে প্রত্যাঘাত করা যায় না, পার্ণবিক করা যায় না, অটলের কথার বিশ্বাসের কঠিন
ধাতব আশ্রয়ে বাধা পেয়ে ফিরে আসে।

‘ঠিক আছে, তোমার কেনা আমি শোধ করে দেব।’

‘তুই কেনে শোধ করবি। তোর টাকা লুপই-বা কেনে।’

‘চুরিডাকাতির টাকা বলে।’ চরম ক্রোধাগ্নি যেন শূন্যে অরণ্য পেয়ে যায়,
প্রকলিত হবার অপেক্ষায় ছিল ঘনসন্নিবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী, বায়ু ধোসরে অসংখ্য
শিখার আগ্রাসী ভিহ্না ক্ষুধার্তের মত এগিয়ে যেতে থাকে। মাথা কাঁকিয়ে জগা
বলে, ‘কোন শালা চোর নয়, ডাকাত নয়, বড়লোক এমনি হয়, তুমি প্রমাণ দিতে পার,
তোমার পায়ের কুকুর হয়ে থাকব।’

‘ওসব কথা ছাড়। আমি তোকে বাঁচিয়েছি, তার শোধ দিবি তো?’

‘হ্যাঁ।’ জগা আবার স্বাভাবিকতায়, ‘ঠিক ধরেছ। আমার মন চাইছে। জানি
এমনি লিবে না। তোমাকে কাজ করিয়ে দেব।’

‘কী কাজ? ডাকাতিতে যেতে বলবি?’

‘ঠাট্টা করো না অটলদা, তুমি বলে ভাই। অন্য কেউ হলে—’

‘শুন, শোধ যখন দিবি, তখন চুরিডাকাতি ছেড়ে দিয়ে রিক্সা চালা, মর্নিষ
খাট, কত কাজ রইছে, আর মদও ছাড়। তাহালেই শোধ-বোধ। ধম্ম থাক, তোকেও
ধম্ম দেখবে।’

জগা মাথা দোলায় ‘ওসব হবে না। গরুবাগালি তুমি ছাড়তে পারবে?’

‘তা ভিন্দ কাজ পেলে ছাড়তে পারি।’

‘তাহলে ছেড়ে দাও। তোমাকে কাজ দেব।’

অটল বলল, ‘ঘর যা জগা, আমিও গাই দুইতে যাই, গরু খুলতে হবে।’

ঘরে কুলুপ এঁটে অটল বেরিয়ে পড়ল।

অটলের মধ্যে যে বালকটির বাস, যে গরু চরায় বিনভার ভোলা-পদাই-বিক্টু-
গোপালদেবের সঙ্গে মাঠে, ডাঙায়, ডোবার ধারে, খালের কিনারায়, বনের পাশে
ড্যাংদুলি, হা ডু-ডু, তালপাতার ডাঁটির ব্যাট করে তিনটে কাঠি উইটেক বানিয়ে
রান করে, বাউন্ডারি হাঁকার, পঙ্কজের গান করে বেসরুরো গলার, ছেলেমানুষি
যে কোন উযোগে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়, বোকামি মনে হয় না, সে যেঁতো জগার

প্রস্তাবে বড়ই হর্ষ অন্তর্ভব করে। যেন হাতে একটা লাডু পাওয়া, কিংবা খেলার বল পাওয়া, কিংবা টিরাপাখির বাচ্চা পাওয়া কিংবা নখর একটা কুকুরহানা সংগ্রহ করার মতই আহ্বানবিত্ত হয়। সে প্রাথমিক ভাবনার জগাকে ভালমানুষ মনে করে কসে। কেমন মন দেখ, কেমন বাঁচিয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা দেখ, তার রোজগার বাড়িয়ে দেবে, হ্যাঁ গরুবাগালি করতে হবে না। তারপর অবশ্য শম্ভা ছায়া পড়ছে। আকাশে সূর্য আড়াল করতে আসা কালো মেঘ ফিকে থেকে একেবারে রৌদ্রকে ধরেমুছে পগান পার করে দিচ্ছে। সে ভাবছে, জগা ডাকাত, মোটেই সুবিধের লোক নয়, খুনোখুনি মারামারি করে, মদ খায়, লখনাকে খুন করবে—ও ভাল হয় কী করে। উ'হু বাবা অটল ওসবে নাই। কিন্তু নাই বললেই যে লাল নীল সবুজ হলুদ আলো নাচে। কাজের মধ্যে, ঘরে শূদ্রে, রান্না করতে করতে, তারপর গরু চরাতে গিয়ে ধূমলনগরের ডাঙায় সে আলোর নাচন সে না ঘোঁষে পারে না। সে মূখ বজ্জে ছিল। কিন্তু ওরা যদি খোঁচার, 'ও অটলকা কী হয়েছে তোমার, ক'দিনই দেখছি গুম হয়ে আছ—কী ভাবছ—শরীর খারাপ?' তখন তো বলতেই হয়।

গরুবাগালদের মধ্যেও গোষ্ঠী রয়েছে। মাইলচারেক বৃত্ত করে যে গ্রামগুদুলি তার মোটামুটি সম্পন্ন চাষী ঘরগুলোতে বাগালের সংখ্যা কম নয়। বেলা ন'টা নাগাদ গরু ভেড়া মোষ ছাগলের পাল নিয়ে গাঁ ছাড়ে সব ঘাসের সম্মানে। ঘোঁদকে বেশি ঘাস, নিচু জমি, খাল-খন্দ সোঁদকেই পাল যায়। এ-পালের গরু ও-পালে চলে যায়, বিশেষ করে বাছুরগুলো, শে'বু হুজোত। যাই হোক মোটামুটি ভোলা, পদাই, বিষ্টু গোপাল, কখনও নিম্নে আর ফালতু একসঙ্গে পাল বাঁধে। বরসে ভোলা বছর পনের হল। সাননের বছরই চাষে লাগবে। লুঙ্গি হাঁটুর উপর ডবল ফেটি করে পরে, গায়ে স্যাস্বেডো গেঞ্জি। রান্নার বাগাল। পদাই ভোলার চেয়ে ছোট। রোগা চেহারা, প্রায় রোগে ভোগে। বিষ্টু সবায় চেয়ে ছোট, চালাকচতুর। স্কুলে পড়াছিল। গত বছর বাগালিতে নেমেছে। অটলকে এরা মান্য করে, তবে বন্ধুত্বের হাওয়াটাই ধরা থাকে অসমবয়সী মানুসটার সঙ্গে।

রোদের বেলায় ওরা চারজনে ডাঙায় মাঝে হাঁড় নামে আরতকার পুকুরটার পশ্চিমের চওড়া পাড়ের উপর অবস্থগাছে ছায়ায় বসে আছে। গরুগুলো হাঁড়েরে ছিটিয়ে, নজর রাখতে হচ্ছে।

অটল বলল, 'আমি গরুবাগালি ছেড়ে দিছি। ভিনু কাজ করব।'

ভোলা পদাই বিষ্টু আজ আবার গোপালও এসেছে, এমন অসম্ভব ঘোষণায় গরুগুলের মুখ দেখে, শব্দ হারিয়ে ফেলে, চোখের পাতারা স্থির অটলকে তারা

চেসে, মিথ্যে বলে না, কথাতার গুরুত্বের স্বার্থে টানও রয়েছে।

অটল কারও দিকে না তাকিয়ে বলে যায়, ‘বুঝলি বাগালি করে চিরকাল ত চলবেক নাই—বয়স হয়েছে। তোরা ছোট ছেলে, ভোবের এসব সাজে। বল্ আর কেউ বাগালি করছে বুড়োবয়সে, করে, মূর্খনিষ না হয় কিষেন, না হয় মিশি না হয় এ-দোকানে সে-দোকানে কাজ—তোরাই বল্।’

ভোলা বলল, ‘কিন্তু কী কাজ করবে তুমি? চাষ! কে জমি দিবে? বোকান?’
‘তা জানি না।’

ভোলা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, ‘তা জান না, আর কাজ ছেড়ে দেবে। গায়ে থাকবে ত, না গোপীকাকার পারা চলে যাবে?’

গোপী বেনাচিতিতে দৃষ্টির সঙ্গে গিয়েছিল, সম্প্রতি পুরো পরিবার নিয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুরে ঢের পরসী, ঢের সুখ, কাজের অভাব নেই, সংবাদটা গায়ে প্রচার করার সবার মনে ছায়া ফেলেছে।

অটল বলল, ‘আমি গাঁ ছাড়ছি না। যাব কুখা?’

‘গেলে চলবে? গ্যাংঠিপালের গরু কে চরাবে? একটু গরুর লেগে ত লুকে বাগালি রাখবে না কাউকে!’ পদাই এমন করে বলে অটলের মূখের দিকে তাকিয়ে যেন বৃত্তান্তাগের মূল সমস্যা এঁাই।

ভোলা অসহিষ্ণু গলাতে বলে, ‘তুমি কী করবে বল দেখি।’

‘ভিন্দু কাজ। বললম ত। জগা বলেছে কাজের ব্যবস্থা করবে।’

‘ডাকাত জগা। তুমি ওর দলে যাবে? ডাকাতি করবে?’ আতঙ্কিত স্বরপাতে গলা কাঁপে বিষ্টুর। বলে, ‘এই ভোলা অটলকা কী বলছে রে!’

ভোলা কী বলে। সেও তো অবাক। আচমকা আছাড় খাওয়ার আঘাতে বিহ্বল। ফ্যালফ্যাল চোখে সব তাকিয়ে থাকে।

অটল বিব্রত গলায় বলে, ‘তোরা যে কী—ডাকাতি করব কেনে!’

‘ডাকাতি করবে না ত ও শালার সঙ্গে করবে কী? ডাকাতির মাল বিচতে যাবে? তোমার হস কী বল দেখিনি!’

পদাই বলল, ‘ও শালার কাছে যেও না, তোমার সম্বনাশ হয়ে যাবে। কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে—জেল খাটতে হবে। এ হে, তুমি কত ভাল লোক—। তুমি—।’

অটল বলে, ‘তোরা কী বল্ দেখিনি। জগা কাজ দেব বলেছে, ডাকাতি করতে বলে নাই। দেখি কী দেয়। ডাকাত না হয় হয়েছে, কিন্তু মানুষ ত বটে—বেশ উকে বাঁচন দিলম্—আমি কী বাঁচন দিরোছি, হয়ে গেল, তার লেগে আমার উপকার

করতে চাইছে। মন আছে বলেই ত। সবাই উকে ডরায়, খিমে করে, আমি করব না। উর উপকারই করব। মতলব করছি ভালমান্দ্ব করব।’

‘উর সঙ্গে মিশে তুমিও ভাকাত হয়ে যাবে?’

‘না জগাই ভালমান্দ্ব হবে?’

‘হবে না। হবে না।’ তিনটি কিশোরই গলা মেলায়।

‘বাজী রাখ।’

ভোলা বলল, ‘বাজী। বল কী বাজী।’

‘বশ টাকা।’

‘না, আমরা চারজনে বশ করে চাঁদল টাকা দ্বব। তুমিও চাঁদল দিবে।’

‘ঠিক আছে।’

‘তাহালে ওই কথাই রইল। লাও, তিন সত্যি কর।’

তিন সত্যি কাড়া হয়। তারপরই নীরবতা। আবহাওয়া বদলে গেল। দ্বিবিয় রোদবেলার নানা মজা হয়। পঙ্কজসের গান ধরে পবাই, ‘শুন গো ও মাধবী তুমি কী আমার হবে’ কিংবা ‘নিরুম সম্ভার’, গালগল্প হয়, তর্ক কিংবা কোন নতুন খবর— এখন কিছু থাকে না। রদ্বদ্বদ্ব উ’চু ভূ’ইয়ে যে আগের বাতাস বয়ে যাচ্ছে, হীড়ের পাড়ে গাছে যার শব্দ, অশ্বষের পাতার বার কীপদনি, তার উর্ধে একটা ডাহুক বিলম্বিত লয়ে ওখারের মহুরার পাতার আড়ালে ডেকে চলেছে।

অটল কিছুক্ষণ পর বলল, ‘মরতে মরতে বেঁচেছে, ঢেক বদরক্ত বোরিয়ে গেইছে। বদ্বালি—।’

কেউ কোন উত্তর দিল না।



শিবপুত্রে বৃহস্পতিবারের হাটে জগা নিশিকান্তর চায়ের দোকানের বোজিতে বসে আছে। দাঁড়িয়ে ধীরে, ফনে, আর একজন অচেনা লোক। তিনটে সাইকেল স্ট্যান্ড-করা। অটল এসেছে বামুন ঠাকরুণের হাট করতে। অনাদি চক্রবর্তীর বিধবা। বাড়িতে পুরুষ নেই। ছেলে চণ্ডীদাস নিরুদ্দেশ হয়েছে। অটলের হাট লাগে না। বিবি আলদতে চলে যায়। বামুনীপাড়ার হীরুর দোকানে চাল, তেল, নুন থেকে আলু, বেগুন সবই মেলে। মেলে বললে হবে না, কম পরসাতেও পাওয়া যায়। আখানা বেগুন কী পাঁচটা ঘোশালাইয়ের কাঠি কী একটা পেঁয়াজ। ঠাকরুণের ঘরে চা রুটি খেয়েছে। একটা টাকাও দেবে। ঝটপট হাট সেয়ে ফেলেছে। ফর্থ তো কম নয়। হাতের ব্যাগের পেট ফুলে গিয়েছে। দ্দ' হাতে দ্দটো হাটের ভিড়, ব্যাপারীদের হাঁকডাক, কথা, শুল্কের মাঠে রোদের সকাল সরগরম। মন্ত হাট নয়, এক চিলতে, মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ ব্যাপারী, শতখানেক বেড়শ খস্দের। ঘরে উৎপাদন শাক কি অন্য আনাজ নিয়েও বসে যায় অনেকে, বসেছেও।

দ্দ' হাতে ব্যাগ নিয়ে হাট চক্কর ছাড়বে, জগার ডাক, 'ও অটলদা হাট হল?'

'হ্যাঁ।' অটল হাসে, 'বসে আছি।'

'এস চা খাও। নিমে স্পেশাল চা, দ্দটো বস্কুট দে।'

অটল মাথা নাড়া দেয়, 'আমি চা খাব না। খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ব্যাগ দ্দটো রেখে বস দেখি। তাহলে চিন্তা-ভাবনা করলে কিছদ্?'

অটল ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়েই থাকে, 'কিসের?'

'কী আশ্চর্য! তোমাকে বলে এলম কাজকম দ্দব।'

অটল বলতে চায়, কাজকম কী! চুরিডাকাতিতে ত থাকব না। বাড়ি ঘরিয়ে দেখে সহদেবমাস্টার সাইকেল ঘরে দেখছে তাকে। ওদিকে ভূতো আর পরানের চোখ আঁও চোখ দেখছে, হিসেব করছে, সন্দেহ করছে। গা ঘামা বাড়ে অটলের।

'ভূমি ত ভাল শগের দাঁড়ি পাকাতে পার। ধীরে তোমাকে শগ দিয়ে আসবে। দাঁড়ি পাকিয়ে দেবে অবসরে। খার্টনির দাম খারাপ পাবে না।'

কাজটা অটল বেশ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে। শগের দাঁড়ি, দড়া পাকানো,

খাটিয়া বোনা, মাছ ধরার চাবজাল বোনা, ছিপ তৈরী করা, মাছ ধরার চার বানাতে পি'পড়ের ডিম থেকে কৌচো কী ভেতো মদের ভাত সংগ্রহ, পাকানো, কুড়ুল কাটারি-বা-কাশের বাটি বানানো, ত্রিপল, চটের বস্তার সুচারু সেলাই সে চমৎকার করে এবং বড়ই আনন্দের সঙ্গে। উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'পাঠিয়ে দিস্—করে দব্‌ !'

'গামছা কিনেছ ?'

'না ।'

'টাকা পেলে কিনবে—কেমন ?'

'হ্যাঁ, কিনব। তাহালে চাঁল, ঢেক কাজ আছে ।'

নিশিকান্তর ময়লা লুঙ্গির উপর সামান্য ভূঁড়ি, যেমো কালো গাল ফোলা ভারী মৃথ। চায়ের গ্রাস বাড়িয়ে ধরে বলে, 'লাও ।'

অটলের দ্ব' হাতে ব্যাগ। মাথা নাড়া দেয়। বলে, 'খাব না ত বললম ।'

জগা আর অনুরোধ করে না। নিম্পলকে তাকিয়ে থাকে। যেন গায়ের পরিচিত মানুস নয়, অন্য কাউকে দেখছে। এমন আঙ্গব জীব চকোতে আছে এ বুদ্ধি ধারণাতীত। তাচ্ছিল্য করতে পারছে না। মাথার ক্ষত এখনও শুকোয়নি। ভালই কেটেছিল। সেলাই পড়েছে। দাগ থাকবে না। চুলে টাকা পড়ে যাবে। কিন্তু এই অটলদা—এই মানুসটা।

অটল আর দাঁড়ায় না—হাঁটা দেয়।

সাত কোর্জ ওজনের মত শগের দশটা গাঁট দিয়ে যায় ফনে। বলে, 'তাগাদা নাই। অবসর করবে। কুড়ি টাকা ধর। বাকী কাজ হলে—।' অটল নেয়, শণ কাটে। কিন্তু ওতেই কাজ শেষ হয় না। জগা জাল বিস্তৃত করে। সে কাজের ঔরঙ্গ লাগিয়ে দেয়, বাও মাংস নিয়ে এস শিবপদুর থেকে, মোড়ল গায়ের গিয়ে গাওয়া ঘি আন, দাঁদির গম ভাঙিয়ে এনে দাও শিবপদুর থেকে, ছিপ তৈরী কর, খাটিয়া-বুন—। তরঙ্গে ভাসমান ভায় অটলের সময় চুরি হয়ে যায়, টাকা আসে। বাগালি করে যাচ্ছে অবশ্য। জগা উঁচু দাঁত দেখিয়ে হাসে, 'হুঁ হুঁ বাবা বলতে পারবে না এমনি এমনি তোমাকে দান করছি। খাটছ—পয়সা লিছ। এতে কারও কিছু বলবার নাই ।'

কিন্তু জগা বলেই লোকের কথা বলার ঢের জায়গা থেকে যায়। এতদিন অবসরে সে লোকের ছুটকো কাজ করে দিত। কারও জন্যে হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে দেওয়া, কারও হাট করে দেওয়া কি কাঠ চালা করা কি কমলা বয়ে আনা, ধানের বস্তা নিয়ে যাওয়া—এই সব ছুটকো কাজ আর কী! এসবের জন্যে পারিশ্রমিক যে

সব সময় পেত, তা নয়—তাতে কী—সে করত। এখন সময় কোথা ! তো সময়টো অটলের মাগে কোথায়, এ তল্লাশ লোককে করতেই হয়।

গরু চরাতে গিয়ে মাঠের দুপূরে ভোলা বলে, 'খুব ভাবসাব হয়েছে জগার সঙ্গে। খুব কাজ করছ উর।' যোগ দেয় পদাই বিষ্টু ওই কথায়। অটল বলে, 'তা করছি! দেখাবি, জগা ভাল হয়ে যাবে, ডাকাট থাকবে না। বাজী রেখেছি মনে রাখিস।' ওরা বলে, 'তুমিই ডাকাট হবে সঙ্গদোষে—সবাই বলছে।' বামুন ঠাকরুণও বলে, 'ডাকাট এর স্যাঙাত হয়েছে শুনলাম। কী সম্বন্ধে কথারে।' অটল ওয়াকার ঠাকরুণকে আশ্বস্ত করে, 'স্যাঙাত কেনে হবে! বুঝলে, জগা লুক খারাপ নয়। কপাল দোষে অমনটি হয়েছে। দেখো উ ভাল হয়ে যাবে।' ঠাকরুণ আশ্বস্তবুদ্ধির মধ্যেই বলে, 'জানি না বাবু। শোনার পর তোকে দেখেও ডর লাগে।' অটল বলে, 'কী যে বল ঠাকরুণ, আমি অটল—অটলই আছি—থাকবও।' সহদেবমাটোর, 'শোন, শুনো যা' করে লম্বা হাত বাড়িয়ে ভেঁকে বলে, 'এই যে শেষকেশ জগার দলে ঢুকলি বাবা—আর ভয়গা পেলি না।' অটল বিব্রত গলায়, 'দলে ঢুকব কেনে, ওর কাজকর্ম করছি', বলা সত্ত্বেও সহদেব বলে, 'ওই হল, সং সঙ্গে সঙ্গ বাস, অসং সঙ্গে সর্বনাশ, পদলিশের হুড়ো খেলেই টের পাবি। বুঝে পারাও ওই বেদবা মাগীর জন্যে, ডলি নাম বটে নয়, টাকা খুঁজছে ত। আহা মুখ নামাতিস্ কী! লাজের কী বাটে। মেয়েমানুষের লেগে বেটাছেলে রাজস্ব ছেড়ে দেয়, তুই ত ভাল মানুস ছাড়িছিস।'।

ডলি একে দেখেও দেখে না, সামনা-সামনি হতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কথা বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে আরও তো সবাই অটলকে, জগা স্পর্শ তাকে নষ্ট করতে চলেছে। কেমন করে সে বোঝায় ওর কাজ করে দেওয়া, পরসো নেওয়া, কিছু কিছু কথাবার্তার মধ্যে টের পেয়েছে, জগা মানুষ, এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়। কেমন করে বোঝায়, না মিশলে বদলানো যাবে না, তার দেনার টাকাটা জোগাড় হয়ে গেলেই সে জগাকে নিয়ে পড়বে, পথ থেকে ফেরাবে, বুঝিয়ে দেবে সহস্রচক্র ধর্ম মাথার উপর থেকে সব দেখতে। শেষ বিচারের দিন জাবদা খাতা খুলে তিনি পড়ে নেবেন, তারপর শাস্তির নির্দেশ। এখন পায়ের নিচে অগ্নিকুণ্ড, বিষধর সাপের ফণা, বিছের বিছানায় শোয়া, তন্তু তেলের কড়াইয়ে টগবগিয়ে ফোটা। জগা বুঝবে। ধম্ম আছেই। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দিতে পারে অটল। ঢের ঢের আছে তার অভিজ্ঞতায়। জগা তার দিকে চলেছে, দেখা কম করে ফনে ধীরেই দিয়ে কাজ পাঠায়, তবে তার ব্যবস্থাও সে করবে। কাছে ঘন ঘন এলে সে বোঝাবে! সময়ের দরকার।

অটলের এ ব্যাপারে কোন ছেলেমানুষি নেই। ধর্ম আত্মশীল জীবনধারা পদক্ষেপকে সংযত, স্বজ্ঞ, সাহসী করেছে। ধর্মকে সে দেখেনি। ধর্মরাজ ঠাকুর তো গান্ধেই, বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজো হয়, তেল সিঁদুরে মাখা বাবার শিলাখণ্ড, মূর্তিও হতে পারে, সব চাপা পড়েছে তেল সিঁদুরে, ঠাওর করা যায় না। বাবার পদ্মজায় সে উপোস করে, নতুন ধূতি আর নতুন গামছা গায়ে জড়িয়ে মাথায় করে আনে অন্য ভক্তাদের সঙ্গে ভাঁড়ার। মাটির ক্ষুদে কলসীতে মদ। বাবা বাণেশ্বরকে নিয়ে ঘোরে। এই ধর্মঠাকুরের দিকে কত সময়ই একা অপলকে তাকিয়ে থেকেছে। না, তিনি বেরিয়ে আসেননি। তবে ধর্ম অটল প্রত্যক্ষ করেছে।

গোপালপুরের উপরবাঁধে চক্রবর্তীদের সঙ্গে ঘোষেদের মারামারির সময় সে দাঁড়িয়েছিল, দেখেছিল লাঠি চলতে, রক্তপাত হতে, তারপর থানা পদলিখ। নাদু চক্রবর্তী বলেছিল, ‘তুই আমাদের হয়ে সাক্ষী দিবি। পুঁথিয়ে দেব তোকে। গোবিন্দর মাথা ফেটেছে। লাঠি ছিল বলাইয়ের হাতে। বলাবি।’ কিন্তু গোবিন্দরও তো লাঠি ছিল। সে তো হাত ভেঙে দিয়েছে পরেশের। সে কথা বলতে নাদু চক্রবর্তীর টোকা মাথা চাপা নাকের মধ্যে ঢুকে থাকা চোখ বড় বড় হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, ‘তুই আমাদের পক্ষের সাক্ষী। তোকে ও কথা বলতে হবে না।’ অটলের সর্বিনীত উত্তর ছিল, ‘সত্যি ত বলতে হবে, এজ্ঞ ধর্ম বলে একট কথা যে রইছে।’ নাদু চক্রবর্তীর ছোটখাট শরীরটার ভেতর থেকে নাঘের গর্জন এসেছিল, ‘ধর্ম আবার কী রে! ধর্মটা কী!’ চক্রবর্তী পূজো-আচা করে, ঘরে নিত্য নারায়ণ সেবা, তার মত ‘ছোটলোক’ ছুঁয়ে ফেললে স্নান করে, কত শাস্ত পড়ে, কত মন্তর জানে, ঠাকুর দেবতার কত কাছের লোক—অটল তাকে কী করে ধর্ম বোঝায়। তবে বুদ্ধি ছিল বৈ কী। তাকে সাক্ষী মানেনি। বলেছিল, তোকে সাক্ষী করলে মরতে হবে। দরকার নাই। অটল টের পেয়েছিল, ভয় পেয়েছে চক্রবর্তী। এ ভয় কী তাকে? ভয় তো ধর্মকে। গরু খুলতে ভজন সাহার ঘরে রোজ যায়। ওদের একটা কাঁসার থালা চুরি গেল। উঠানে পড়েছিল। ভজনের ভাগনে এসেছিল। সে বলে কী না, ‘এই লোকটা তো গরু খুলতে এসেছিল। আর কেউ আসে নাই।’ ভজনের বৌ শূনে হাঁ হাঁ করে ওঠে, ‘কাকে কী বলছিঁস্, ও করবে চুরি!’ তার দিকে ফিরে বলেছিল, ‘কিছু মনে করো না তুমি।’ কী সম্ভ্রম ঠাকুরগণের। সে তো অটলকে নয়—ধর্মকে। নুটুগেরস্ত প্রায়ই বলে, ‘কম্ম দোষে ছোটলোক ঘরে জন্ম, তুই তো বামনের উপর।’ সেও তো অটলকে নয়, তার ধর্মকে সম্ভ্রম। আরও আছে। অটল লম্বা ফিরিস্তি ফেলতে পারে। চিনি তার বৌ মাঝেমাঝে রাগ করত বটে, তবে বলত, ‘ওমা

তোমাকে অবিশ্বাস, বলি কে করবে—দুনিয়াতে এমন মানুষ আছে?’ চিনি তার আরও চোখ টেনে রাখত। কী অপরাধ মদ্দাই না গড়ে উঠত। চিনি অবাক মানত, ‘কী করে যে তুমি থাক—রাগ নাই, রোষ নাই, সকলিতে সন্তুষ্ট। কারও জ্বিনশে হাত দিবে না, কাউকে মন্দ কথা বলবে না, চুরি বাটপাড়িতে থাকবে না, শত্রুমুদ্র লুকের উপকার করবে—না বাবু তুমি কারও পারা লও। জান চকার গোপালপুরের সব বলে, অটলের পারা মানুষ হয় না। এ বা, স্যামীর নাম করে ফেললাম।’ জিভ কাটত। স্যামীর নাম করা উচিত নয়—কিন্তু চিনি যেটুকুবার নাম করত, কতবার জিভ কেটে লাগিত হত তার ঠিকঠিকানা নাই। বলে, ‘লোক ঠিক বলে, তুমি একদম ছোটছলে। ছোটই বট। এটুকুন! এটুকুন!’

চিন্দু ওই সুখ—এ তো ধর্মের দান। অটলের এ সব ভাবনার আত্মিক জোর আসে। সে তান, ধর্ম প্রচাণ্ড শাস্তিশাসী, অসম্ভবকে সম্ভব করে।

সন্ধ্যাবেলায় মন খারাপ নিয়ে জগা আসে অটলের ঘরে। দু’ চারদিন ছাড়া ছাড়া ঝড়ঝল হয়ে যাচ্ছে। জলের চেয়ে ঝড়ই বেশি। ফলে তাপে আবার ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম পরিমণ্ডলে। কিন্তু এই যে বৃষ্টি, এতে চাষের গুনগুনানি শোনা যাচ্ছে। বীজতলা প্রস্তুতে লাগল পড়ছে কিছু জমিতে। পচা খড় আর গোবর সার যাচ্ছে গরুর গাড়িতে, পড়ছে ক্ষেতের মাটিতে। চাষ আসা মানে কাজ আসা। আর বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, দিনজুড়ে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র। তাপ খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় আবহাওয়াও বমন করছে, গা-জনালানি উষ্ণ। বাতাসের বড়ই মৃদু বীজন।

জগার পাঞ্জামার উপর হলুদ গেঞ্জি, শক্ত উঁচু কলার, গলায় একটা সরু সূতো বদুপের হার, হাতে বালা, পায়ে হাওয়াই চম্পল। সে ঘোষালপাড়ার বিষ্ণু ঘোষালের ঘরে ডাকাতের কেসে ফেঁসেছে। ফেঁসেছে মানে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাদিপুত্রের কেটে হাড়ীর গ্যাংয়ের কীর্তি ওটা। বৃন্দন ধরা পড়ে তার নাম করে দিয়েছে। কেউটা এটা দেখানো। এসপুত্র থানার বড়বাবু সব শুনেনেও খবর পাঠিয়েছে, হাজতে পুরে প্যারি, সরে থাক—তিনশ টাকা দিয়ে যা। জগাকে টাকাটা দিতে হল। ঘরে দাঁড়ির সঙ্গে টাকা নিয়ে ঝগড়া। হাত তার ঢুঁ ঢুঁ। মোষ চুরির টাকা খতম, মাথা ফাটানো। লখনার উপর শোধ নেওয়ার সুযোগ হয়নি। ফনের আবার দু’শো টাকা দরকার। দিতে হবে। থানিদার অর্থাৎ তার চোরাই মালের ত্রেতা ভুজঙ্গ সাহা হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছে। সিগারেট দিয়ে বলল, ‘মাথা ফাটাতেই কাৎ হয়ে গেছি। ছেড়ে দিলি নাকি কাজ কারবার।’ শুনেনে তাড়না মাথায় টিকির

টিকির করছে, 'জগা জয় মা বলে নিশিকালে কাঁপা বাপ'। অন্যদিকে নিষেধ, 'ঘোষালপাড়ায় সব ডাকাতি হল, হাওয়া গরম, ঠান্ডা দরকার, পর পর কেস হলে উপরের টনক নড়বে, দারোগা বাপও বাঁচাতে পারবে না উপরের হুড়োয়, পুরে ফেলবে। তারপর কেস, আদালত, জেল। খৈয়' ধর চাঁদু!'

এ সর্বকিছুর তালগোল পাকান অনুভূতির বিপরীতভাবে জগা যেন ভর দুপুরের প্রখর রোদে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে। ঢের রক্ত নিগত হয়েছে, শরীরের দুর্বলতা কাটছে না। এদিকে উক্টে জব্বার একটা আশ্রয় পাওয়া থেকে শুরু হচ্ছে। অটলের কাছে আসার ইচ্ছেটার মধ্যে সে টের পেয়েছে খানিকটা আরাম অনুভব করবে। মানুষটার আকর্ষণ শক্তি আছে। এর কোন ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না। অটলের কথা, চাউনি, হাসি, লোভহীনতা, নীতিবোধ, সরলতা যেন আলো ছাড়িয়ে রাখে। কী চমৎকার আলো! এর সত্য জব্বার চোখ স্পন্দিত হয়, মাস্ক কোষের উদ্ভাপ প্রশমিত হয়ে আসে।

এখন অটলের ঘরের মাটির নিচু দাওয়ায় বসেও সেটা টের পায়। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'কি অটলনা বাঁধছ! আমাকেও ভাত দিবে নাকি?'

'খাবি?'

'দিলেই খাই। দাঁড়াও, তোমাকে চাল আলু এনে দি। দু'টো ডিমও আনি।'

'খাবি বলছি—খাবি। অত কিসের! কিছু লাগবে না।'

'তাই হয় নাকি!' জগা উঠতে চায়।

অটল বলে, 'বস' দেখিনি। ও সব অমনলে ভাত দিতে পারব না। আলু এনেছি, একডুং ডিঙলে আছে। পোস্ত করব। আর কলাইয়ের ডাল রুচবে?'

'খুব। কিন্তু তোমার খরচা—'

'কী ভাবছি—তোকে ভাত দিলে গরীব হয়ে যাব।'

জগা মজা করে বলে, 'বড়লোক বট তুমি।'

'বটই তো দাবি চলে যেছে। কেবল ওই ছিদেমের দেনা রইছে—এই যা।'

'ছিদেমকর টাকা তাহলে তুমি দিবে। মরা মানুষের দেনা যে কে শোধ করে!'

অটলের উদ্দন ধরানো হয়েছে। এ্যালুমিনিয়ামের ছোট ত্যাবড়ানো কালিপড়া হাঁড়ি। চাল ছাড়ে বাটির জলে ধুয়ে। কাঠের আগুন, জ্বললেও ঘোঁরা ছেড়ে যাচ্ছে। বলে, 'বিড়ি কলাইয়ের ডাল খেতে ভাল বটে, কিন্তু সিজতে ঢেক কাঠ পুড়ে, আমি ত আর্ধসিজই নমাই।'

জগা কোন উত্তর দেয় না। দাওয়ায় বসে দেখে সম্ভের আঁধার ক্রমে ঘন হয়ে

উঠল। একটা চট্ হেঁটে গেল ওদিকে। গায়ের নিশিঝিনুনি শব্দ হরে গিয়েছে।
শব্দ নেই, চলাচল নেই।

‘অটলদা সগাই আমাকে ডরায়। তুমি ডরাও না?’

‘ডরের কী আছে। তুকে মায়া লাগে! শুন জগা, ভগবান হাত পা, গায়ে খেমতা দিয়েছে কিসের গলে—না, খেটেখুটে ঝাও। দুর্নিয়াতে ঢেক কাড়। লুকের কেড়ে-কুড়ে খেলে অশ্ম হয়, লুকে ঘিয়ে করে, আঁভশাপ দেয়। মানুষকে কাঁদালে নিজেকে কাঁদতে হয়। আঁভশাপে বিষ থাকে। জীবনে মরণে সেই বিষে পুড়তে হয়।’

‘আঁভশাপ প্রবার কী! দুর্নিয়াতে কোন শালা সাকা? সব পান্দাবাজ! কেউ কারো দুখ দেখে না, কষ্ট বোঝে না, মায়া নাই। সব মানুষই সবাইকে কাঁদায়।’

‘হার যেমন চোখ! খারাপ মানুষ ঢেক আছে। তা বলে নিজেকেও খারাপ হতে হবে। ধম্ম নাই?’

অসহিষ্ণুতার বক্রমুখে জগা বলে, ‘তুমি যে কী ধম্ম ধম্ম কর। ধম্মকে বগলে নিয়ে ও ঘাবছ! কী হয়েচে? এ বয়সেও গরুবাগালি। বৌদির চিকিচ্ছে করতে পারলে না। হাত পুড়িয়ে খেছ। দেনদায় হয়ে আছে একজনোর কাছে। ঘরের ত এই হাল তোমার।’

অটল গায়ে মাখে না। বলে, ‘জগা এসব খারাপ কাড় ছেড়ে দে।’

‘ছেড়ে দিয়ে কী বড়ো আঙুল চুষব?’ জগা উত্তেজনায় ঝাঁকড়া চুলের মাথা নাড়়া দেয়, ‘তোমার কাছে মাথা ঠাণ্ডা করতে এলম, গরম করে দিছ—আমি চললম।’

‘বস। হোর জনো ভাতের চাল নিয়েছি।’

‘আমি খাব না।’

অটল বলে, ‘না খেলে আর কী করব। খাবি বললি, এখন না খেয়ে আমাকে অধম্ম করাস্ না। তুই আমার অতিথ।’

‘আবার সেই অধম্ম ধম্ম।’ জগা মাথা নাড়়া দেয়, ‘ধম্ম না ছাই। বুঝলে এ তোমার ডর। বল নাই। আমার বল আছে, ডর নাই, তাই ধম্মও নাই। তোমার ভাল করার লেগে মরিছি। আর তুমি ডরে শামুকের পারা গুটিয়ে থাকছ।’

‘আমিও হোর ভাল করতে চাই।’

জগা এবার শব্দ করে হাসে, ‘লাও ঠালা, কারট ঠিক কে বলে দেবে।’

কথার মধ্যে উঠানের অন্ধকার ভেঙে ওপাশ থেকে ধীরে আসে। লম্বের লালচে সিঁদা পড়ে তার উপর। লম্বাটে মূখের কপালে চওড়া কাটা দাগ, মাথার কোঁকড়ানো

চুল, গায়ে স্যাণ্ডা গেঞ্জি, কোমরে বাটিক প্রিন্ট সবুজ লুঙ্গি। সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'বসে রইছিঁস এখানে—ওদিকে বড়বাবু নীলুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, রাতে চকা রেড করবে। সরে থাকতে বলেছে। উপরের চাপ পড়েছে ঘোষালপাড়া কেসে।'

'শালা ফালতু কামেলা।'

'বড়বাবু আবার দ্'শো টাকা চেয়েছে।'

'শালা, ডাকাতি।'

ধীরে অটলকে দেখে নেয়। হাত বাড়ায়, 'সিগারেট দে তো!' জগার বাড়ানো সিগারেটটা নিয়ে লক্ষ্মি ধরিয়ে পাশে বসে।

'টাকা এখন কোথা পাব?'

'জানি না।' ধীরে সিগারেটে ধোঁয়া ছাড়ে, 'সবাইকে খবর দিয়েছি। সরে থাকবে আমাদের দলের সবাই।'

'বড়বাবু মহা হারামী।'

'শ্রীকৃষ্ণের পারা লয়। শ্রীকৃষ্ণের বাচ্চা যেতে শাস্তি। মেজববুও নাকি চলে যাবে।'

'আর একটু উর বদলি আসবে। হাত সেই এক থাকবে।'

'কিন্তু কত বসে থাকবি। কিছু ত করতে হয়। একবার ঘাবি গোঁসাইয়ের কাছে—ভালমন্দ দেখিয়ে আসবি?'

গোঁসাই রক্তবস্ত্রে, কপালে সিঁদুরের গোল স্ফটিকে, রক্তচন্দনের ছোপ লোমশ বুক-বাহু কাঁধ কণ্ঠ, ঘাড় বরাবর কাঁচাপাকা চুলে, দাঁড়ি গোঁফের ঠোঁট টাকা দীর্ঘতায়, পাটল বুক, গমগমে কণ্ঠস্বরে যথার্থই রহস্যময়তার কারবারী। বাড়ফুঁক, বিষ নামানো, কবচ, তাবিজ, ক্রিয়াকরণ, গণনা, ভবিষ্যৎ বাণী ইত্যাদি নিয়ে অদৃশ্য অশুভ শক্তির ক্রিয়াকাণ্ড ব্যস্ত করতে পারে, নির্দেশ দেয়। গাঁজায় বৃন্দ হয়ে থাকে। ঢুলুঢুলু চোখে বলে, আমি কে বাঁচি হে, তেনারা যা বলান তাই বাঁচি। জগাকে বড়ই স্নেহ। খড়ি পেতে শূভ সময় জানায়, সাবধান করে। মদ মাসে নিয়ে প্রায় সময়ই তারা দুজনে বসে। গোঁসাই সংসার করেনি। শিবপুত্রের দক্ষিণে বড় পুকুরের ধারে মাটির চালাঘর, ত্রিশূল পোতা মা কালীর বেদী। ঘরে আছে বাঁসনি বাউরি। সেই সব করে, মধ্যবয়স্কা নিঃসন্তান নারী গোঁসাইয়ের রক্ষিতা।

'ও তো বলেছে ভাল সময়। শালা, তাহলে খারাপ সময় যে কাকে বলে।' জগা আলগা গলায় কথাটা বলে ক্ষীণ নীরবতা রেখে প্রশ্ন করে, 'লখনা, বাস্দি ছোঁড়া দুটো নিয়ে ঘুরছে?'

‘হ্যাঁ, যেটা বুঝেছে, একা হলেই তুই ছাড়বি না। বলি কী—।’ ধীরে একবার পিছন এবং আশপাশের অন্ধকার দেখে নিরে চাপা গলায় বলে, ‘শালাকে না মেরে উর ঘর মারতে চল্।’ বলিস্ ত ব্যাঙস্থা করি।’

‘জেলে ঢুকবার সাধ হয়েছে?’

‘তা বাইরে মরার চেয়ে জেলে বেঁচে থাকা ভাল।’

‘আনিস্ না তো জেলের সুখ।’

‘তুই তো একবারই বহরমপুর দেখেছিস্।’ তাও ছ’মাসের লেগে।’

তগা ও কথার দিকে যায় না। বলে, ‘ধীরে তুই সরে পড়। শিবপুরেই চলে যা তুই। ভুবনের ঘরে পাত গা।’

‘কিন্তু টাকাটা ব্যবস্থা না হলে! এ রকম চলবে নাকি?’

‘কাল শুনতে পারবি। সকালে শিবপুর মোড়ে আয়।’

‘তুই কোথা যাবি?’

‘দেখি। ও অটলদা হল তোমার ভাত?’

‘তুই এখানে যাবি!’

‘হ্যাঁ। অটলদার কাছে নিমস্ত্রা নিলম।’

ধীরে কৌতুকের গলায় বলল, ‘ও অটলদা আমার নিমস্ত্র হবে না?’

‘হবে। কস্। নিমস্ত্রা তুরগু। খা কেনে!’

ধীরে বলল, ‘অটলদা মাইরি বাগাল ছোঁড়াই থেকে গেল।’

‘চুপ মার। চলো যা।’

‘সে আর একট সিগারেট।’ ধীরে হাত বাড়ায়। সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়।

অটল বলল, ‘অধম্ম শান্ত দেয় না। বুঝ, ঘরে শূন্যে পারবি না শান্তিতে। কখন পদলিখ আসবে তোর ঘুমও হবে না।’

‘তোমার ভাত হল!’

‘এই হয়ে এল। ইবার আলপদ্ম করব। খিদে লেগেছে?’

‘না। তাড়াহাড়ি আছে। কেনে যে তোমার হাতে খেতে মদন হল। এমন কথা বলছ পিঠি জ্বলে যেছে। উঠে যেতেও পারছি না, তোমার অধম্ম হবে নাকি! আমি উসব যানি না, তুমি মান—কেনে তোমাকে কণ্ট দিই।’

‘আমার লেগে তাহলে ভাবনা তোর হয়েছে!’

‘হ্যাঁ, ফাঁসিয়ে দিয়েছ তুমি আমাকে!’

‘তুইও আমাকে ফাঁসিয়েছিস্ জগা !’

‘আমি আবার কী ফাঁসালম্ ! আমার লেগে তুই ভাবিস্—আমি তোমার লেগে ভাবব না ?’ উনুনের দিক থেকে মৃদু সারিয়ে অটল বলে, ‘তুই কিন্তু কথার রাখিস্ না !’

জগা বলে, ‘কথা রাখি নাই !’

‘হ্যাঁ ! লখনাকে মারার মতলব করছিস্ তোরা !’

‘ওটা আমাদের ব্যাপার ! তুমি কেনে মাথা ঢুকুছ বল দেখিনি। তোমার এত দরদ লাগছে কেনে ?’

‘বাঃ লখনা মানুষ ত বটে। মানুষ মানুষকে মারবে কেনে :

‘মানুষই তো মানুষকে মারে, মানুষই মানুষের সম্বনাশ করে।’

‘অধম্ম। ওইটি চলবেক নাই।’

সুদীর্ঘশাল শক্তিমানেব আদেশ যেন করে অটলের মূখে। জগা অবাক মানে। অন্ধকার চরাচরে প্রকম্পিত অমোঘধ্বনি গভীরতর বিশ্বাস থেকে উৎক্লিপ্ত হয়ে জগার মাথায় পাক খেতে থাকে। সে ধনিরহস্যের বদ্বিশ্গাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। অনুভব করে তার শক্তি, বিশ্বাস দৃঢ়তা—জগার জীবনকে হাটানর জন্য প্রশস্ত করা বন্ধদেশ এবং পা জোড়া যেন অদৃশ্য মৃগদ্বরের আঘাতে ন্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে অটলের খেতে ডাকায়, নিজেকে ফিরে পায়।

ভলি কাঁদতে মাছ ধরছে। এক চিলতে জল। কাদা রাঙে জল বলে চেনা দেয় না, কাদার ঘোল যেন। চকার উত্তরে এই কাঁদর বা খালটা বয়ে গিয়েছে। জায়গায় তায়গায় ক্ষুদ্র ভোবার আকৃতি নিয়ে জল জমে থাকে। ঘোষণা জটিতেও খানিকটা জল কোন কোন ভোবতে থেকে যায়। পুকুর ভেঙে, ক্ষেত ভাসিয়ে জল নামে কাঁদরে পড়ে গিয়ে ক্ষুদ্র কৃষ্ণকর্ণা নদীতে। এ ভোবাগুলোর পুঁটি, মোরলা, দাঁড়কে, মাগদুর, চিমদুর, চ্যাং, কই ইত্যাদি মাছ থাকে। এগুলোর মালিক নেই, মাছচাষও কেউ করে না। বয়ে আসা জলের মাছ সব। ফলে যার খুশী ধরতে পারে।

অটলের বকনাটা সরকারী পশু চিকিৎসাকেন্দ্রের পূর্বরীয়া খেয়ে দিবা শক্তি অর্জন করে ফেলেছে। রোগ নেই এখন, কিমিয়েও থাকে না। অটল নিজের পালে চরাতে না নিয়ে গিয়ে গাঁ বাইরে পুকুর গাবায় ছেড়ে দিয়ে যেত, এক জায়গাতেই ঘোরাঘুরি করে তৃণ সংগ্রহ করত বকনাটা। শক্তি আসতে এখন পুকুর গাবা ছেড়ে

অন্যদিকেও ছোটো। কাঁদরের দিকে চলে আসে। কাঁদরের গর্ভে জারগার জারগার শ্রীমৎ ও সবুজ ঘাসের চাবড়া মেলে। আজও এদিকে এসেছে। ভোলাদের হাতে গরু রেখে বকনাটাকে কাঁদরে দেখতে এসে তার চোখে পড়ে ডালিকে। একদিন ডালি সম্ভ্রমলায় ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, ঘনিষ্ঠতার তাপও বিকিরণ করেছিল, কিন্তু গরুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পর হো কোন কথা নেই, ফিরেও দেখে না।

ডালির হাঁটুর উপর বিবর্ণ সবুজ ছাপা শাড়ি কাদা মাখামাখি, বৃকের আঁচল শক্ত করে জড়ানো। কাদার ছিটে মূখে গলায় বৃকে। মাথার চুল বাঁধা। কাঁধের কাছে গুলেছে পেটোমোটা সরু, মূখো বাঁশের 'খাড়াই', মাছ রাখে যাতে।

দেখেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছেলি অটল। কিন্তু ডাকে আবার ঘাড় ঘোরাতে হয়। গজা, কাঁধ, বাহুমূলের নগ্ন চিকনতা, শ্রুনের বন্ধনভেদ, পেলব মাংসল তরঙ্গ, ঠোঁট চোখ এবং কাদাভুলে দাঁড়ানর এক পা বাড়িয়ে কোমরের বাঁকে, নারীর রমণীয় ভঙ্গীটি আকর্ষণের ডানা ওড়ায়। চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও পাত্ত না।

'আমাকে দেখে এদিকে এলে !'

অটলের উত্তর সরাসরি অমন কথায় যেন জড়তায় এসে যায়। মূখভর্তি 'আঠা—' 'চট আঠা। ঠোঁট ফাঁক হয়ে একটা শব্দ বের হয় শব্দ, বিকৃতির শব্দ।

'লাজের কী আছে ! দেখাচ্ছেলে বট। মেয়েমানুষের টানে না এলে পরুষ পুরুষের দাম কী !' এর বান্দ্র সাফ কথা বলি, চোর ছ্যাঁচোড়কে আমি ঘিহ্নে করি।'

অটলের মুখেচোখে কাদার কাপটা লাগে। মোছার ভঙ্গীতে সে বলে, 'চোর ছ্যাঁচোড় ! আমাকে বলছ !'

'আবার কাকে ! মাঝিঘরে অমন ডাগর ডাগর জোড়া খাসি চুরি করলে !'

'আমি !'

'হ্যাঁ। জগার দল করেছে। তুমি ত ওই দলেই আছ।'

'না—আমি দলে নাই !'

'নাই বললে লোকে শুনবে কেনে ! এখন স্যাঙাত হয়েছে। মদ মাংস সব খেছ ত উর সঙ্গে !'

'মদ !'

'হুঁ। মদ খেয়ে মাতাল হলে কা'ডজ্ঞান থাকে না, যা 'খুশী' করা যায়। খাবে—কেমন !'

'আমি মদ খাই না।' অটলের যেন রাগ হয়ে যায়। বলে, 'জগা কাজ দেয়, আমি করে দিয়ে পরসো লি। আর ডাকাড হলেও উ ত মানুষ বটে। ভাল করব উকে।

ভোলাদের সঙ্গে বাজি রেখেছি, জগাকে ভাল করব।’

ডলি শরীর দু'লিয়ে হাসে, ‘জগাকে ভাল করতে পারবে? উল্টে ডাকাত হবে।’ বলে, ‘তা আমার সঙ্গে কথা বল না।’

‘তুমিই ত মুখ ঘুরিয়ে লাও। দেখেও দেখ না।’

ডলি দ্রুত গলায় জিজ্ঞাসা করে, ‘তাতে তোমার কষ্ট হয়?’

‘কি বললে?’

‘কিছু না। আমি সাঙা করছি—তা জান।’

অটল বোকা বোকা চোখে তাকায়। মেয়েমানুষের সেদিন তাকে হাসি ভুলে দিতে বলা, ঘরে ডাকা, শরীরের ভঙ্গী, কথা বন্ধের মধ্যে ঘূরপাক খেতে, তারপর দেখেও না দেখা কষ্ট দিয়েছে। ডলির কথা ভাবতে শরীরে সে শিরশিমে অনুভূতি টের পায়, ঘুমন্ত এক সুখবোধ আড়মোড়া ভাঙে হৃৎপিণ্ডে, শিরাপাথে পেশীতে পদুম্বন্ধা এক পেলব অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে আকর্ষিত হয়। এখন তারই সাঙা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিয়ের কথা অর্চিম্বত আঘাত হানে। সে যুবতীকে দেখে। কখন যেন তারই হয়ে গিয়েছিল। মরে যাওয়া বৌ চিনির স্মৃতি থাকে না, তার শরীর গন্ধ থাকে না, তার স্বর্ণ সূতের নিবিড়তা থাকে না। কিংবা মরেও যেন ডলিতে ফিরে এসেছিল চিনি, সেই নারী বহু দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে, তারই কষ্টবোধের মোচড় অনুভব করে সে।

‘শুধু না কার সঙ্গে সাঙা হচ্ছে আমার। ফনের সঙ্গে। বলবে কিছু!’

অটল সম্মোহিতের মত না বুঝেই না-সচক মাথা নাড়া দেয়।

ডলি বলে, ‘আমি কিন্তু বলতাম। তুমি যদি কাউকে সাঙা করবে বলতে তাহলে বলতাম, না করতে পাবে নাই। যদি বলতে কেনে, বলতাম, স্বার্থ আছে আমার। তুমি বলতে পার না? ডর কিসের? বল সাঙা করো না বলতে মুন হচ্ছে না?’

ডলি সামান্য থেমে বলে, ‘তোমার মুখ দেখব না, কথা বলব না ভেবেছিলাম। আমার কথা রাখ নাই। জগার সাঙাত হলে। কিন্তু ভাবলে কী হবে—থাকতেও পারাছিলাম না। মন পড়ছিল তোমার লেগে। কখন ঘরে আসবে আমার। না এলে আমিই ডেকে আনতাম। যাক্ কাদর ধারে ত আমার লেগে এলে।’ ডলি হাসে। বলে, ‘হাঁ করে খালি আমাকে দেখছ—কথা বল।’

‘কি বলব!’

‘ফনের সঙ্গে সাঙাতে আপত্তি না থাকলে কিছুই বলতে হবে না—চুপ মেয়ে থাক। চলে যাও এখান থেকে।’

‘আমার বলার মুরোদ কোথা ?’

‘কেক মুরোদ আছে । নিজেকে তুমি জান না ! হুব ত ধম্ম মান ! একট মেরে-
মানুষকে বাঁচানো ধম্ম লয় ?’

অটল উত্তর খুঁজে পায় না ।

‘সম্বেবেলাতে আমার ঘরে আসতে পারবে ?’

‘পারব ।’

‘আমি খাটেতে পারি, ভাতের সেগে ভাতার লাগবে না আমার । যদি বল
কিসের সেগে, বলব জানি না । তাহলে সম্বেতে এসো । আরে হাঁ করে আমাকে
দেখছ গরুর পারা । সাতাসাওয়া গরু লও, পুরুষ বট । এখন যাও দেখি ।’

ভালির কাছ থেকে সরে এলেও অটলের মনে নারীর ঘন ছায়া থেকেই যায় । কথা
এবং শরীরের যুগ্মতায় তার কামনার মেঘ এখন জমে । অঝোর বৃষ্টিতে ভেঙে
পড়তে চায় । সে সম্বেবেলায় যাবে, চপ করে থাকবে না, সে পুরুষ—ভালি অঃ
কথা বলতে পারে, সে পারবে না । শব্দ একটাই ব্যাপার জগাকে নিয়ে । তার যে
ভাল করার দায়, ভালি মদঃ দেবে কি । ভুলে গিয়েছিল অটল, এখন মনে পড়ে
ফলকে দিয়ে খুন করানির মওলব আছে । ওরনি নারীর কামনা, ভালবাসার কথাগুচ্ছ,
আঁচলের উষ্ণতা যেন ডানায় ভেসে যায় । ভালির সব মাধুর্য বরে যায় শব্দকে পাঠার
মত । দাঁড়িয়ে থাকে ভালি আর গর্দাঁড়, যেন কঙ্কাল । অটল যে কী করে :

প্রশ্নটা মূর্ছে যায় বকনাটাকে দেখে । বড় স্নেহের চোখে সে দেখে । ঠিক ঘাসের
গণ্ডে চাল এসেছে—যা ভেপেছিল । আহা, বেচারিা থাক্ ভেবে সে থমকে থাকে ।
আকাশ তকতকে । রোদের কড়া থাম্পড় পড়ছে এখন গায়ে । কিন্তু গরুর জাতঃ
মুখ লাগালে নড়তে চায় না । তারপর এমন নরম ঘাস কাঁদরের গর্ভে, ওঁদিকে বাবলা
গাছের পর পর ছায়া । অটলকে আবার পালে যেতে হবে । বেলা পড়লে গরু
ঢুকিয়ে দিতে হবে ঘরে ঘরে । এঘর সেঘরে অলপস্বল্প কাজ থাকলে সম্বে ।
বকনাটাকে গাঁয়ের মধ্যে পুকুরগাবায় রাখবে । পিঠে হাত রেখে হেট্ হেট্ করায়
যেন ও বরুা ফেলে, ঘুরে বিপরীতে হাঁটে, যাবে না । রোগ মুছেতে তেজ দেখ !

বকনাটা ডাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় ধরল পদমিস্তি । সাইকেলে বাঁধা লম্বা
সাইজ করা কাঠ । থমকে বলল, ‘তোমার সেই বকনাট । মরে নাই ?’

‘মরলেই হল ।’ অটল বকনার পিঠে হাত রাখে, ‘জল পড়লে খোলতাই
কেমন হয় দেখবে ।’

‘কার ওষুধে ভাল হল ?’

‘ডাক্তারের। চারবার ওষুধ পড়ল। কি খাবুটেই না হয়েছে। চললে কোথা ?’

পদমিস্ত্রির অবাধ চোখ বকনাটার উপর, ‘মরাটকে বাঁচালে—’

‘আমি বাঁচানোর কে ? শিবের ধন।’

পদমিস্ত্রির যেন মনে পড়ে যায়। যেমো কালো মুখ, ছোট মাথা, পাজামার উপর কলার ছেঁড়া হাফশাট, রোগাটে চেহারা, ক্ষুদ্রে চোখে আশপাশ দেখে নিয়ে বলে, ‘ভাল কথা, আমি শুধু ভাবছিলাম তোমাকে। দেখাই ও হয় না। তুমি জগার সঙ্গে নিয়েছ ? আমার ও বিশ্বাসই হয় না। বললাম, অটলের পারা ভাল মানুষ উ সবে থাকতেই পারে না।’

অটল বলল, ‘থাকব কিসের লেগে ? জগাই আসে আমার কাছে।’

‘ওই যে বাঁচিয়েছ। বুদ্ধলে পাস্তা দিও না। তোমার বদনাম হয়ে যেছে। চাঁল। রোদ যা বাড়ছে।’ সাইকেল হাঁটিয়ে যায় পদমিস্ত্রি।

অটল বিরক্ত হয় না। এত লোকের কথা, ভোলাদের সঙ্গে বার্জি রাখার জন্যে প্রায়ই ওদের কথা তোলা, খাঁসি দুটো চুরি করাত, হেরে গেলে দাও টাকা, ডিলর মন্তব্য, এর ঐর টানটানিতে, আসক্তিতে বিচলিত হয়ে ওঠা—সবই যেন দাঁড় করিয়ে রেখে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। জগা ভাল হবেই এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চয়তাই এর কারণ।

লোকের ঘরে গরু চুকিয়ে বকনাটাকে পুকুরগাথা থেকে নিয়ে আসতে মরা গোখুঁল। সান্ধ্য অবশ্যায় প্রকৃতির আমন্ত্রণ এসেছে। আঁধার নয়, ধূসরতার ছায়া মাখামাখি। অটল দেখে, দাওয়ায় বসে আছে জগা। ওদিকে চ্যাং বাঁদা মুরগী।

‘কতক্ষণ বসে আছি। এখানেই খাব। মুরগীও খোঁড়ি, আনছে, কেটেকুটে দিয়ে যাবে। কোল আর ভাত লাগাও। সেদিন খেয়ে খুব তৃপ্ত হয়েছে।’

অটল বলল, ‘রন্ধে কর্ জগা। আমি ওসবে নাই।’

‘কেন ?’ কোঁচকানো ভ্রু জগা বলে, ‘মুরগীটা চুরি করা লয়। রামামুচির বোয়ের কাছে নগদ বাইশ টাকা দিয়ে কিনেছি। শূদ্রিয়ে এস।’

‘মুরগী না হয় চুরি করিস্ নাই, মাঝদের খাঁসি জোড়া এ চুরি করেছিস্।’

‘আমি ছিলম নাই। ধীরে ফনে বাদলা ওরা সব। দেখছ ত পুঁলিশ ফ্যাপা কুকুর। কিছু করা যেছ না। ওদের ত চালাতে হবে।’

‘তার লেগে চুরি করতে হবে ? সব তো জোয়ান। খাটতে পারে না ?’

‘খাটনি কোথা ? কে দেবে ! তোমাকে খাটিয়ে দু’ পয়সা দু’ ভেবেছিলাম

দেখছ ও কাজই দিতে পারছি না চাবতাল বোনার পর—। দুটো ভালই পড়ে আছে। হাটে বিক্রি হয় নাই। খাটার মর্নিং টেক—খার্টনিই নাই। জমি ছাড়া এ পাশে সইভেই-বা কী !

‘পঞ্চায়েতের ক্ষেত্র কাজ ! পুকুর কাটা, প্রান্তাঃ মাটি দেওয়া, লোন দিচ্ছে কত !’

‘এই জনোই বাগাল থেকে গেলে ! ওসব কাজ ক’দিন !’

খাঁকি হাফ প্যান্ট, খালি গা, কোমরে গামছা বাঁধা খোঁড়া এসে দাঁড়াল, ‘দাও বর্টি দাও ! গলপাত আছে ? কেটেকটে রাখল কিসে ?’

অটল বলল, ‘মুরগীটা ভগার দিদির ঘরে নিয়ে যা !’

‘না। খোঁড়া বর্টি, পাত, ভোগাড় করে কেটে আন। এখানেই আনিব !’

খোঁড়া হাতে তুলে নিতে মুরগীটা দু’বার ডানা নেড়ে শব্দ করে।

অটল অসহায় গলায় বলল, ‘আমি রান্নাতে পারব না। রান্নাও তোর দৃঢ়ের না !’

‘খুব রুচবে। তেলমশলা সবই খোঁড়াকে দিয়ে আনা করাছি। আর শুন, তুমি রান্না, কাঠ দিলে, খাটলে, তোর দাম আছে। খাওয়াছি না, খেটে খাবে। জমি আমার পারা ডাকাতের রোগ্যারের ভাত মাংস তুমি এমনি এমনি খাবে না !’

‘আমার আজ রান্নাতেই ম... নাই। মুড়ি খাব ভেবেছিলাম !’

‘বুকেলে অটলদা, সেদিন তোমার কাছে থেয়ে যে তৃপ্তি হয়েছে, আর সাঁও বজ্রি এ ক’দিন ঠিকঠাক খাওয়াই হয় নাই—তুমি আর না করো না। অশ্ম হবে !’

অটল ভাবে, তা হবে বৈকী। ক’দিন ঠিকঠাক খাওয়া হয়নি। সে না হয় রোঁধে দেবে। এবু বলে, ‘তোর জন্যে আমার সব বদনাম করছে !’

‘ভালমানুষের গায়ে বদনাম লাগে না। হাঁসের পালকে যেমন জল লাগে না !’ জগা বলে, ‘গাঁয়ের লোক আমাকে ছি-ঘিন্বে করে, তুমিও করলে কুখ্য দাঁড়াই !’

‘আমার কাছে দাঁড়াতে গেলে চুরি ডাকাতিতে থাকা চলবে না !’

জগা ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, ‘ছেড়ে দব। আবার সাইকেল রিকশ চালাব !’

অটল উৎসাহিত হয়, ‘খুব ভাল হবে !’

লম্বা শ্বাস ফেলে জগা বলে, ‘তুমি আমাকে খুবই বিশ্বাস কর। জান কেউ করে না !’

‘করবে। কাজে দেখিয়ে দে !’

‘ভাল কথা, তোমার দেনাশোধের টাকা হল ?’

‘হয়েছে। কাল-পরশু যাব ভাবছি আমোদপুর। ছিদেমের বোত ওখানেই থাকে। দেনাশোধ করলে আমার গা থেকে জ্বর নামবে !’

‘তোমার কথা বলছিলাম শাখাকে। বলল, দেখ কত ভালমানুষ আছে এমনি।
একদিন আসতে বলো আমাদের ঘরে।’

‘শাখা কে?’

‘ভরতের বোন। ওই যে রিকশা চালাত আমার সঙ্গে। অ্যান্ড্রিডে’ট হল।
চাপা পড়ল লরিঙে। বছর দুই ত হয়ে গেল।’

অটল বলল, ‘হ্যাঁ। হ্যাঁ। শুনছিলাম। তা বাপ মা আছে?’

‘মা আছে। ভাই ছিল একটিই, দু’বোন রইছে এখন। তবে ছোটর বিয়ে
হয়েছে পাণ্ডববরে। জামাই কোলিয়ারিতে কাজ করে।’

‘হ্যাঁরে জগা, ছেলেট ত মরেছে। সংসার চলে কী করে।’

‘শাখা পোষ্টমাণ্ডটারের ঘরে কাজ করে, মা-ময়ের চলে যায়।’

‘ছোটর বিয়ে হল, শাখা বিয়ে করল নাই কেনে।’

‘না, করল না।’ জগা বলল, ‘করলে ত বেঁচে যায়।’

‘বলিস্ কী। ও কী হোর দায়।’

‘কি যে কার দায় অটলদা, তা কে বলতে পারে!’

‘খাঁড়ি কলাপাতার মুরগী কাটাকাটা করে আনে। তারপর দোকান থেকে এনে
দেয় তেলমশলা। ঘরে চাল আলু আছে।’

অটলকে রাগা করতে হয়। তার মধ্যেই সে জগার প্রেমকাহিনী শোনে। সম্ভা
গাড়িয়ে পড়েছে। অঁপার কালি মেখে সামনে দূর একাকার। লম্ফের শিখা বাতাসে
কোঁপে আগুনে আলো ছড়িয়ে রাখে।

শাখার সঙ্গে প্রেমের শুরুরটা শিবপুরে জগদ্ধাত্রী পূজোর মেলায় সময়। ভরতের
বোন বলে জানা ছিল। কিন্তু মেলায় সেদিন শেষ বিকেলে ওই সংসর্ক নয়, এক
অপরূপা ওরুণীকে সে দেখে। গায়ের রঙ কালো, মাঝারি দেহগঠন, ঈষৎ লম্বাটে
মুখ, বড় বড় চোখ, শাড়ি ব্রাউসের মোড়কেও সুউন্নত স্তন, কোমর, কপালে রূপোলী
টিপ, গলায় সোনালী পর্দিতর মালা, হাতভর্তি কাচের চুড়ি, সব মিলিয়ে তার কাছে
এক সৌন্দর্যশালিনী। সে তখন শিশু আলো দেখছে, আলো টানছে তাকে, যেন
পতঙ্গ। বিকেলের মেলায় তেমন হা ভিড় নেই। রাতে পণ্ডরসের আসর বসবে।
তখন পাঁচ-গাঁ ভেঙে আসবে। চা, তেলভাজার দোকান, মাটিতে পাতা কাচের
চুড়ি, কমদামী স্টেশনারীর সারিবন্দী দোকান, মিষ্টির দোকানের মধ্যে মাঠটার
ঘুরছে খুবই কম লোক। বেশিরভাগই ছোট ছেলেমেয়ে। বাঁশি বাজছে, বেলুন
উড়ছে। শাখার সঙ্গে ছিল ওর বোন। তার দিকে চোখ রেখে ছুরি মারা হাসি

শাঁখা বারকতক ছুঁড়ে দেয়। এঁগিয়ে সেই প্রথম কথা বলে। ওর বোনকে দুটো টাকা দিয়ে 'বা মিষ্টি খেয়ে আয়' বলে কথা বলার সুযোগ করে নেয়। শাঁখা বোকে তার খাচায় বন্দী হয়েছে পাঁখি। ঠোঁটে ঝুলন্ত হারিসটুকরো সে রাখে, যেন দানাপানি পাঁখি খেতে আসবে। বলে, 'হাঁ করে কী দেখাছিলে আমাকে।' জগা সাহস করে সে মূহুর্তে বলে: পারোনি। সেই শব্দ। তারপর ভয়তের দুঘ টনায় মৃত্যু, ওদের পরিবারের সঙ্গে মিশে যাওয়া, শাঁখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সে বন্দ হয়ে যায়। শাঁখা বড় বিস্ময় তার কাছে, কতকুই-বা মেয়ের শরীর, চেপে ধরলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, অথচ সে ভয় পায়। টের পায় এর ভেতরটা সম্পূর্ণ দেখতে পায় মেয়ে। সাইকেল-রিক্সা চালানো বন্দ করে চুরি-ডাকার্তা হতে থাকার পর শাঁখা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কেঁদেছে, পায়ে পড়েছে। সে শাঁখার জন্যে খেটেই খাব বলে ছাড়তে চেয়েছে— পারোনি। শাঁখা এখন এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না বলেও রাখে, কথা বলেও চায় না বলেও কথা বলে, ঘেঁষা করেও কাছে ডাকে, টাকাপয়সা নেয় না, অথচ অভাবের কথা বলে। এ বড় কট্টর। বিয়ে করে সংসারী হলে জগার কাশলা মিটত। মেয়ে যেন শরীরে বিস্ম হয়ে থাকা একটা এঁর। উৎপাদন করে ফেল যায় না। রক্ত ঝরায়, যন্ত্রণা দেয়। হাটে ফলকে ডেকে একে শুনিয়ে কথা বলে, ফাটা মাথা দেখে চোখের জল ফেলেছে, আবার ঘেঁষাও দেখিয়েছে।

অটলের শূন্য মনে হয় শাঁখা বড়ই ভালবাসে, ঘোড়ার সঙ্গে যায়নি জগার কাছ থেকে। কথা বলে না সে এঁর অভিমানে, ভালবাসায়। অটল অনুভব করে তাকে ভাল করার একটা সঙ্গী সে এঁহলে পারে। এর সারা মন আচ্ছন্ন করে তগা শাঁখা প্রেমকথা। জগার বলার বাইরেও সে অনেক দৃশ্য দেখতে পায়, অনেক কথা শুনতে পায় প্রেমিকপ্রেমিকার।

রাহা হয়, খাওয়া হয়, জগা চলে যায়। তারপর বিছানায় শুয়ে মনে পড়ে ডাঁলির ঘরে যাবার কথা ছিল। এত রাতে যায় কী করে। সন্মানে যাবে।

সকালেও যাওয়া হয় না। ঘোষেদের হরেন ডেকে নিয়ে যায়। শিবপদুরে বাস ধরিয়ে দিতে হবে। সজ্জের বোঝাটা নিয়ে যেতে হবে। বিশ কোজ-র মত চাল আছে। না করা যায় না। তিনটে টাকা দেবে। দুপদুরে ডাঁলির ঘরে গিয়ে দেখে ভালো ঝুলছে। কে জানে কোথা গিয়েছে। গোঁসাইয়ের মেয়ে ফুল বুলল, 'ডাঁল-কাকীকে খুঁজাছিলে!' ঠোঁটে রহস্যভরা হারিস, কেমন যেন চাউনি, কী যে বলতে চায়! ভালবাসার কি কোন গন্ধ থাকে, মূখে না বললেও সবাই টের পায়!

চলার জীবনে একদিন লেটো আলকাপ ছিল। মালতীর শব্দে সিধুর দল ছিল, নামও করেছিল দল। নেমস্তম্ভ পেত বিভিন্ন গাঁয়ে। হারমনিয়াম, ডুগিভলা, বাঁশ, ঢোল, ড্রেসও করেছিল। দল ভেঙেছে কবেই। শব্দ তো চকা নয় লেটো আলকাপই লুপ্ত। যাত্রা থিয়েটার আছে, সে তো ভদ্রলোকদের। গোপালপুরে মাঝেমধ্যে হয় বাঁশ থিয়েটার তাতে চকার মানুষদের নিজস্ব এটা কোথা? কুশলিবন্দ বাপদী বাড়ির নয়, তাদের ভাষার টান নেই সংলাপে, লঙ্কাকে 'সপরে', কুমড়াকে 'ডিংলে', ডিঙিমাছকে 'জালমাছ', গায়ে পথকে 'কুলি', পেয়ারাকে 'আঁজির', গায়ে লাগা কি লঙ্কাকে 'বাজা', কাককে 'কেয়া' এমন কত কথাই এটা বলে না, 'বটে'র ব্যবহার করে না—বড়ট ভল। ফলে ইদানীং ঝাঁকসু, মর্শিদাবাদ ডিঙিয়ে আসতে চকার মোঠা গানও তারগা পেয়ে যায়, ভিড় ভাঙে আসরে, বলে ঝাঁকসু গায়ের, যা পঙ্করস, লেটো আলকাপ কুমুর যাত্রার মিশ্রিত এক আধুনিক রূপ। পুরোনকে নতুন রঙে নতুন ঢঙে সাজানোগোছান। কৃত্রিম আলকাপ শিল্পী জনজন্ম সরকারের। তবে তাঁর নাম ক'জন জানে! শিল্পীর একটা দল পঙ্করস গিয়ে গেল ক'মাস আগে। আবার আসছে পরশু। ভোলা বিলুপ্ত গরু চরাতে গিয়ে ঠিক করে সম্মেবেলায় যাবে। অটলকেও সাথে হবে।

'তোরা ছেলে-ছোকরারা যা। আমি যাব না।'

'তুমি কী গো কাকা, দেখবে কত মজা। টিকিট আমি দব।'

'তুই দিবি কেনে ভোলা, যাই যদি আমিই দব।'

অটল পঙ্করস দেখতে যায়। মিউজিক, ড্যান্স, পিয়া পিয়া মেরে পিয়া, কোমর দুর্লভ হিন্দী গানের পর নক্সা, তারপরই 'ভাই-ভাইয়ের মিলন' কাহিনী। সরল সার্বাসিদে বড়ভাইয়ের কুছসাধনে আত্মত্যাগে ছোটভাই শিক্ত হয়ে ম্যানেজার হয়। প্রেম করে বড়লোকের 'বিটি'র সঙ্গে, বিয়ে হয়, অতি আধুনিকা ছোটবোয়ের দাদা-বৌদিকে তাচ্ছিল্য, শহরে গিয়ে বন্ধুবান্ধব, পার্টি শার্ড গয়নায় স্বামীকে প্রচুর ঋণে ফেলা, শেষ পর্যন্ত পুলিশ হাঙাতে পাঠায়। বড়ভাই ছুটে আসে। বৌদ গয়না দেয়, দেনা করে ভাইকে বাঁচায়। শেষপর্বে সত্যলক্ষী হয় ছোটবো। দেবতা ভাস্কর দেবী বড়-জার কাছে আসে, গায়ে থাকবে, শব্দেদের ভিটেতে রাঙা শার্ড পরে প্রদীপ জালাবে। দু'ভাইয়ের মিলন হয়, বাস্তব ভাঙা ঘটনার বিন্যাস হাসি কান্না মজা রসসিক্ততার দর্শকরা উৎসাহ হয়, অতি উৎসাহে শিশু মারে, হাততালি দেয়।

সারা রাস্তা নক্সার কৌতুক, ছোটবোয়ের অঙ্গভঙ্গী, বিবাহপূর্ব প্রেমের দৃশ্য, গান নিয়েই আলোচনা। অটল বড়ভাইয়ের মহত্ব, বড়বৌদির মাতৃপ্রতিমতার ঘটনা তুলতে গিয়েও চাপা খায়। দৃশ্য হয় অটলের। গদ্য হয়ে সে হাটে। ভাবে, আহা সব মানুষ যদি বড়ভাইয়ের মত হত।

৪

বৃষ্টি নামে। মাটি ভিজ়ে শস্য পিপাসায় উদ্বেল হয়। গাছ, কোপকাড়, সতাপুচ্ছ, হাসজর্মি পান সেরে স্নান করে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে মাটি। তবে পাখুর মাটির ঢাল, সত্তর রাখতে পারে না, 'জল দাও'য়ের প্রার্থনা নিয়ে চাষের শরৎকালে। লাঙ্গল পড়ছে মাটিতে, গোবর সার ফেলেছে গো-যান, ক্ষেত্রের আল বাঁধা হচ্ছে, কোন ক্ষেত্রের চিবি মেরে সমান্তরাল করা হচ্ছে।

অটল শীতল ভিজ়ে মাটিতে সকালে হেঁটে যাচ্ছে শিবপুরের দিকে। আমোদপুর যাবে! ছিবেমের বিশ্ববাকে ঢাকাটা দিগে আসবে। ঢাকা বড় নছার জিনিস, থাকলে জালা, না থাকলেও জালা। মানুষের সম্পর্ক ওই ঢাকার সূতোয়, পাপপুণ্যের ঘোরাফেরা ওই সূতোয় ধরে, সূতো গোটানো আর ছাড়ার মধ্যেই মানুষের চরিত্র। ভাবনাটা অটলের মাথায় খেলা করে যাচ্ছে। দেনার দায় বড় দায়। ঢাকাটা দিগে আসতে পারলে যেন বেরিয়ে আসতে পারবে কাঁটাবন হেড়। কাঁটাবনই তো! দেনার জালা কাঁটার জালার চেয়েও বেশি।

শিবপুর মোড়ে চোখে পড়ে পূর্ব মেঘের স্রোতরঙা শাড়িতে সাজছে। রোদ নেই। হাওয়ার বৃষ্টি নাহানোর আকুলতা। টানা বৃষ্টির দিন নেমে পড়লে চাষের অসুবিধা। এখনও তো বীজতলাই হয়নি। দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে। চালার দোকানগুলো ফাঁকা ফাঁকা। বেশি পড়ে রয়েছে। বসতে পারে সে। একটা লরি বোরিয়ে গেল, ওদিক থেকে মোটরসাইকেল আসছে। সে নিউজী যাবে, ওখান থেকে আমোদপুরে। চায়ের দোকানে সিঙাড়া ভাজার ঘি ময়দার গন্ধ উঠছে। বংশীর দোকানে জিজ্ঞাসা করে, 'সিউড়ি বাবার বাস এখন আসবে?'

'আটটার আ.ছ।'

পাশে ঠোঙা হাতে নিয়ে অটলকে দেখছিল এক মেরে। বলল, 'অটলবা বটঃ'

'হ্যাঁ।'

'আমি শীঘ্র।'

তাহলে এই শীঘ্র। রোগাটে মেরের পাতলা ঠোঁটে পরিচিতির হাসি। বেগুনি ছাপা শাড়ি, বেগুনি ব্রাউসে ঘেরা শরীর। গলার সবুজ রূপোর রেখা, কানে দুল,

কপালে টিপ। ছোটখাট চেহারা বটে, কিন্তু বড় আঁখিতে টলমলে মায়া, সুন্দরী বলবে না। তবে এক ঢাল কালো চুলে, প্রতিমার মত চিবুকে, কপালে, নাকের গড়ন আর ককবকে দাঁতে মেরের কী যেন আছে—বড় ভাল লেগে যায়।

‘তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ভেবেছিলম চকাতে যাব দেখা করতে!’

‘কী কথা?’

‘এদিকে সরে এস।’ শীখা হাঁটে। দোকান ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। থমকে বলে, ‘তোমার কথা কত শুনছি। ডাকাতট তোমাকে আমার কথা বলেছে ত?’

‘তা বলেছে।’

‘তুমি বাটাও।’ মেয়ের গলা ভেঙে যায়, ‘উকে ভাল করে দাও।’

মেয়ের চললে মুখে কণ্ঠের কালিমা, বুক ভাঙছে, চোখ ছলছল। অটল তো নেহাতই গরুবাগাল, তবু বলতে ইচ্ছে করে, ভাল করে দেব মেয়ে।

শীখা বলে, ‘জান সীতে বাউরির দলে যেছে রিক্সা ছেড়ে যখনই শুনলাম, তখন থেকে পিছা লেগেছি। বৃদ্ধালাম, রাগ দেখালাম, কিন্তু পারছি না। বৃড়োবাবার জল পোড়া আনালাম, কবচ নিয়েছি, কত মানত করেছি, কিন্তু কিছুই না। এই তো মরতে মরতে বাঁচল। শুনলম্ তোমাকে মানিয়া করে খুব, তোমার কাছে যায়, তুমি উকে ভাল করে দাও। আমি পারছি না, ঠিক বুদ্ধলে উ ভাল হয়ে যাবে।’

জগাকে ভাল করার জন্যে মেয়ের আত্মরিক্ততা, আগ্রহ, ভাল হবে বিশ্বাস অটলকে ভরিয়ে দেয়। তার মত গরুবাগালের কাছে কেউ প্রার্থনায় আসে না, মেয়ের কথায় শক্তি উপস্থাপন হয়, বিশালতা আসে তার মধ্যে।

‘ভাল করতে পারবে?’

‘তা পারতে হবে বৈকী!’ অটলের বিশালতায় গম্ভীর ধর্মান বাজে, ‘তোমার পায়া বোনের লেগে ভাল না করে উপায় কী বল!’

‘তাহালে দাদা হলে!’

‘জগার দাদা তুমার দাদা হবে নাই? বোন পেলম সকালবেলাতে। সুখ লাগছে।’

অটল মুখ দেখে শীখার। দেনা শোধ করতে যাবার পথেই সে একজনকে পেয়ে গেল। কে বলে অটলের কেউ নেই পৃথিবীতে। কে বলে? আসলে ঠিকঠিকানা তাদের জানা নেই। আছে, অটলের জন্যে মানদুষ আছে। এত কাছেই তো জানা ছিল না। বুক ভরপূর হয় তার।

শীখা ঘরে একদিন আসতে বলে চলে যায়। বাস আসে। উঠে পড়ে অটল।

আমোদপুরে ছিলামের শব্দে পেরে খুঁজে পেতে কষ্ট হল না অটলের। চেনা জারগা।
চিনির মামার ঘর। খুঁজতে তাই লখারও শব্দে পেরে। আগে আসা বাওয়া ছিল।
গা টুকতেই তিনটে ঘেঁষা ঘেঁষা পুরোন অশ্বখ ডালপালার মন্ত ছাউনি কেলেছে।
পাশেই কামারশাল। বাস থেকে নেমে বাঁধকে হাটলে পুকুরপাড় বাসবীপাড়া।

পূর্বের মেঘে বাসের মধ্যেই কোড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পেরেছিল অটল।
এখন শুকনকে আকাশ। গা-ভেজা মাটি, পথ, খড়ো চাল, জারগার জারগার সামান্য
করে জল ঘাঁড়িয়ে থাকে বর্ষণ চিহ্নে রোদের ছ'টা মাত্রা, তাপ বেশই আছে।

ছিদামের বৌ আশা অবাক তাকে দেখে। চট পেতে বিল ছাওয়ার। খড়ো চাল,
কুপসি ঘর, সামনে উঠান, মদ্যমাখি ভাই বাসুদেবের ঘর, দরজার তাল খুলছে,
উঠানে মুরগী চরেছে, একটা খয়েরী ছাগল শব্দে বেড়াচ্ছে ধোর-ওধার। অটল দেখে
অবাক হয়, ছিদামের বৌয়ের এ কী দশা! বৈধবা শুনাতা শব্দ নয়, মেরেমানবের
সবই যেন চুরি হয়ে গিয়েছে। মাথার শব্দ শব্দ চুল, বসা গাল, শিরা ওঠা হাতে
অমহীনতার আঁচড় ছেঁড়া শাড়ি। ভাবা যায় সেই নৌটিকে। বঙালি শাড়ি, কালো
চুলের মাথা, পানরাঙা ঠোঁট, বরসকে তুড়ি মেরে যেন সর্বদাই নবযুবতী, অহঙ্কারের
ডগমগানি, স্বচ্ছলতার ভুরভুরানি কথার ভঙ্গীতে ছড়াত। তার এ কী দশা।

‘কোথা এলোছলে?’

‘তোমারই কাছে।’

আশার শব্দে বিস্ময় জাগে, ‘আমার কাছে।’

‘হাঁ, তা তোমার ছেলেমেয়েদের দেখাছি না। এত ভাইয়ের ঘর! নাই?’

‘ছেলেটে করলা দোকানে লেগেছে। মেয়ে বামুন ঘরে কাজ করে। ভাই শব্দে-
খরে গিয়েছে কালই, বৌ নিয়ে।’

‘ভাই তোমাকে বেখে ত।’

আশার শব্দে কনো ঠোঁটে বেদনার স্বর বের হয়, ‘যা দিনকাল! মানুষ নিজে
দেখতেই হিমসিম। একসঙ্গেই ছিলম পেথমে, এখন ভিন্ন থাকি। তবে বিপদ-
আপদে দেখে, কণ্ডাকাঁচি নাই। তা তুমি কেনে এলে বন্ধতে পারাছি না। চক
গোপালপুরের কেউ কোন খবর রাখে না—হামিও রাখি না।’

‘ছিদামের কাছে ধার ছিল। তারই শোধ দিতে আসা। ঢেক আগে দিয়া উঁচত
ছিল, পারি নাই। কিছু মনে করো না।’

‘বটালে। ধার ছিল শব্দে ভাবলাম তুমি এতদিন বাধে আধারে এসেছ।’

‘ছিদামের লকের কাছে ধার ছিল?’

‘তা ছিল বৌকি। তা না হলে আমার ভিখারির দশা হয়। পেতও স্নদের কাছে। কিন্তু দিলে ত—কেউ দিলেক না। আমি ত জানতমই নাই।’

‘আমি গন্ডা থেকেই ভেবেছি দিবে দ্বব। জুগাড় করতে পারি নাই।’

‘তোমার কথা ভেবে।’

‘সুদ লব না বলেছিল।’ পকেট থেকে টাকা বের করে অটল, ‘সাড়ে তিনশ। আমার হিসেবের এপাশ-ওপাশ নাই। ঠিক দিছি।’

টাকাটা নিয়ে আশা বলে, ‘হিসেব কখনও ঠিক থাকে?’

‘কেনে থাকবে না।’

‘এই তো আমাকে দেখ, হিসেব ঠিক থাকলে এই দশা হয়? জেবনের হিসেব সব সময়ই গন্ডগোলে। ভাল হল টাকাট পেয়ে। শাড়ি নাই, দেনাও হয়েছে একশ টাকা ভাইয়ের কাছে। শোধ করতে পারব। কিন্তু তোমার কাছে পাওনা থাকতে পারে ভাবিই নাই।’

অটল বলল, ‘ছিদেম আমার খুব উপকার করেছে।’

‘নিজেরও স্বার্থ ছিল।’

‘স্বার্থ ছিল? কো?’

ওষিক থেকে একটা কুঁজো বড়ী এসে দাঁড়াল। আশার কাছে পরিচয় নিল। তারপর চলে গেল। অটল বলল, ‘তোমার কথার রহসিয়া বুঝিছ না।’

‘তুমি ভাল মানুষ বট, তাই সন্দ করনি বৌকে।’ আশা যেন বেড়ে ফেলতে চায়। বলে, ‘বাদ দাও উসব কথা। চকা গোপালপুরের খবর বল।’

‘উ’হু। তুমি যেন কাঁ ভাঙছ না?’

আশা বলে, ‘আমার সোরামীর তোমার বোয়ের গোপন পরিচিত ছিল।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ‘মরা মানুষের চরিত্রের কুবাখান করতে নাই। তুমি এলে, টাকা দিছ হুহু করে উসব উঠে আসছে বৃকের ভিতরি থেকে। তুমি ত জান না এ নিয়ে কত ঝগড়া করেছি। টাকা ছাড়াও গুপনে আরও কত দিয়েছে তোমার বৌকে। একজুং মিথো বলছি না। একদিন দু’জনাকে ধরে ফেলেছিলম।’

‘চিনি। আমার বৌ চিনির কথা বলছ! ভুল করছ নাই?’

‘ওমা ভুল করব কিসের লেগে!’

অটলের যেন সুউচ্চ মনোরম বর্ণময় চমৎকার অলঙ্কৃত প্রাসাদের স্তম্ভ বিশাল দাম্পত্য জীবনের অস্তিত্ব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। খুলিঝড়, শব্দের বিশাল আর্তি ভরিয়ে দেয় বাতাস। তারপর অপার শব্দহীনতা—যেন পৃথিবী মরে গিয়েছে, সাঁড়

নেই। অশ্রুকারের পর কাপসা তারপর ধীরে ধীরে যেন প্রকাশিত হর সামনের দৃশ্য।

আশা বলল, 'কী হল তোমার?'

'বিশ্বেস হচ্ছে নাই।'

'বিশ্বেস করাই—বা লাভ কী। দৃ'নার কেউ নাই আজ।' আশা এখন অটলের মূখ দেখে টের পায় অনর্দিত কাণ্ড সে ঘটিয়ে বসেছে আবেগের বশে। বলে, 'উ নিরে ভেবো না, বো তুমাকে ভালবাসত খুবই। তবে পেটে ছেলে ধরার লেগে থেপে গেইছিল। আমার সোয়ামীর সঙ্গ তারই লেগে। তা হল ফল? কপালে'না থাকলে, মা ঘন্টার কিপা না হলে বাজাই থাকতে হয়।'

ধনু অটল করণ চোখে ঢাকিয়ে থাকে।

আশা বলল, 'কী করব, চামড়ার মূখ বেরিয়ে গেল। তোমাকে কষ্ট নিলম। দৃ'বেলা ভাত জুটেই না, মান'ষট খরচা করে আমার লেগে কিছ্ রাখা নাই।'

'আমি তাহালে চলি।'

'ওমা, যাবে কী! দৃ'পরে এলে, পেয়েদেয়ে যাবে!'

'না। ঢেক কাজ পড়ে।' অটল মূখে বললেও নিঃস্ব মান'ষের মত হাসে, উঠে পড়ে, হাঁটা ধরে। আশা খানিকটা সঙ্গে আসে।

'আবার এসো। আর শুন ভুলে যেও। কী বলতে কী বললম।'

বাসের জন্যে অশ্রুধের ছারায় দাঁড়িয়ে থাকে অটল। চনমনে রোদ উঠেছে। বাতাস নেই। মনে হয়, জীবনের কোন মূল্যবান সামগ্রী যেন অপহৃত হয়ে গেল। টোকাটা শোধ করার আনন্দ মোটেই দাঁড়াতে পারছে না। গা ঘামছে। মনে হচ্ছে সব মিথো।

বাস আসতে সে ওঠে।

শিবপুর মোড়ে নেমে রোদের মধ্যে হাটা। এক মান'ষ গিয়েছিল ফিরে এল কেন অন্য মান'ষ। ছিদামের বো ভুলে যেতে বলেছে, কিন্তু ভুলবে কী, ধারালো করাণের মত শব্দগুলো সূচমূখ তীক্ষ্ণতা নিয়ে কাটছে। চকার দৃশ্য, পরিচিত জন, জীবনের ধারাবাহিকতা যেন একটা বাকের মূখে কঠিন পাথরে আটকে গিয়েছে। তার এগিয়ে যাওয়ার পথ নেই, পিছিয়ে আসার পথ নেই।

নিরুপ হরে সে যাওয়ার বসে থাকে। মধ্যাহ্ন পার হরে রক্তিমতার বিকেল। তার ক্ষমা নেই। যাওয়ার জায়গা স্মের ছিল, বকনাটাকে আনতে হত—থাক। একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে যায় সে। ছিদামের বো মিথো বলেনি। কিন্তু চিনিকে চেনার কী ভুল ছিল? না ভুল কেন হবে? চিনি বা করেছে, সম্ভানের জন্যে! কর্তেই

পারে। যা পাগল হয়ে উঠেছিল। তা বলে নিজেকে ওভাবে অন্য পদে সমর্পণ করা। কিছুতেই যে তার মন মেনে দিতে পারছে না। অবিস্বাসিনীর জন্য ক্লেশ জাগছে না, শূন্য নিজেকে বারবার আঘাত দিতে ইচ্ছে করছে।

ভোলা এসে স্বাভাবিক করে অটলকে। বকসাতাকে উঠান বরাবর করে দিয়ে দেখে। বলে, 'তাহালে এ যাত্রা বেঁচে গেল বকনট। তেজও বেড়েছে। গাই হলে ভাল হবে অটলদা। গড়ন-পিটন ভালই বটে। জানো, ওই পালদের আঁধারের গাইট লিও না। আজ খুঁয়াড়ে যেত। মোড়লদের ফসলে লেগেছিল। ডাকিন্, আনলম।' সামনে ধাঁড়িয়ে চিন্তাম্বিত মূখ্য কালো করা মানুহটাকে দেখে বলে, 'হল কী তোমার? আমদপরে থেকে কখন এলে? দেখা হল না ছিদামকাকার বৌয়ের সঙ্গে?'

অটল সাড়া দেয় না।

ভোলা এবার কাছে এসে তীক্ষ্ণ নজরে মানুহটাকে দেখে। দুঃকৌচকার। হল কী লোকটার। বলে, 'কী হল, রা নাই!'

'বলার কী আছে?'

'তাহলে রা সরল। টাকা নিয়েছে? সুখ চাইছিল?'

'না। সুখ চাইবে কেনে! উত্ত জানতই না। পেয়ে বর্তে গেল।'

ভোলা বলে, 'জগা আবার ঝঞ্ঝট পাকিয়েছ। পদলিগ এসেছিল। দলের সব ফেরার। শূন্য, আমরা বাজি তুলে লিছি। জগাকে ভাল করতে মিশতে যেও না।'

'বাজির কথা লর। উ তুলা পাড়াতে কী যেছে আসছে। জগাকে ভাল করতেই হবে।'

'তোমার কী দায় পড়েছে বলে দেখি। কত চোর-ডাকাত রইছে। সবাইকে ভাল করতে পারবে? জগাকে ভাল করে লাভ কী?'

'লাভ-লোকসানের হিসেব কে করেছে ভোলা। তবে হ্যাঁ, যদি সবাই ভাল হত, দ্বিবি হত। তেমন মদুরোধ আমার থাকলে বস্তু যেতম। ঢেক ধম্ম হত আমার।'

'রাখ তোমার ধম্ম। নিজে যে মরবে।'

'ধম্ম করলে কেউ মরে না। লোকের ভাল কাজ করলে সুখ হয়। মনে হয়, মানুহ জনম সাধক হল।'

'আজ গোপাল আমি বিস্টে সব তাই বলছিলাম, বাজি রেখে ডাকাতের হাতে তুমাকে খানখা ঠেলে দিলম।'

'ঠেলবি কেনে, আমি হুড়হুড়িয়ে নেমেছি। জগাকে ঠেনে তুলব।'

‘নিজেই উঠতে পারবে না। ভাল কলাই ককটে থেকে না। ঘরে এলে বলে
দেবে স্নেন, না আসে।’ ভোলা অনুন্নয় করে। তারপর নিজের মনেই বলে, ‘পুলিশ
বদরব্দর করছে, জগার দলটাকেই জেহেলে ভরবে!’

অল্প পরে বলে, ‘রাখবে না?’

‘না।’

‘খেতে দিইছিল উরা?’

‘না।’

‘ভালে উপোস!’

‘আমি কিছু খাব না।’

‘না খেয়ে মৃত্যু শৃঙ্খনো, আবার বলে খাব না। আমি মোটা মোটা চ্যাংমাছ
ধরেছি। মাকে সরবে কাল করতে বলেছি। তুমি আমাদের ওখানে থাকবে। নেমন্ত্র
লয়। চাল দাও, মাকে বলে ভাত ফুটিয়ে দ্বব। ভোলা ঘরে ঢোকে। হাঁড়ি থেকে
চাল বের করে। গামছার খুঁটে বোঁধে নেয়। এটা মাঝেমধ্যে তাকে করতে হয়।
চাল দিয়ে অটল ওদের ঘরে খায়।

‘ঘরেই তাহালে বসে থাকবে। বকনটকে বাঁধ।’

‘বাঁধছি।’

‘তুমি গুপন করে গেলে। নিশ্চয় কুন্দ কান্ড হয়েছে। পেট কেত ত কথা বার
করতে পারি না।’

ভোলা ভালবাসে তাকে। কিছু ওকে কী করে সে চিনির কথা বলে!

ভোলা চলে যাবার পরই মালতী এসে দাঁড়ায় উঠোন। সন্তর্পণে আশপাশ দেখে
নেয়। রোদের বর্ণে এখন শেষ বিকেলের লালিমা মিলে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে।

‘ঘরেই রইছ। দ্বফরে একবার এসেছিলম, ছিলে না।’ মালতী বসে না।
বাগার সামনে দাঁড়িয়ে আবার একবার পিছনটা দেখে নেয়। বলে, ‘জগা এসেছিল?
দেখা নাই। কাউকে দিয়ে খপরও দেয় নাই! ফনে ধীরেদেরও দেখাছি নাই।’

‘আমি ত কিছু জানি না।’

‘ভাবলম্ তোমার সঙ্গে থব ভাবসাব। জানতে ত পার।’

‘না জানি না।’

স্বর নিহু করে মালতী জিজ্ঞাসা করে, ‘তোমার কাছে কিছু রেখেছে নাকি?’

‘কী রাখবে?’

‘কুন্দ ডিনিস কিংবা টাকা। দ্বিককে ত বিশ্বাস নাই এখন।’

‘রাখে নাই।’ অটল বলে, ‘রাখতে চাইলেই বা রাখব কেন?’

‘ঢাকা দিছ না ত।’ বাঁকা চোখে তাকান মালতী, ‘সবাই বলছে, দেখছিও আমার চেয়ে তুমি আপনান্ন হলেছ।’

‘তাই হয়। তুমি উর বিধি বট। আমি জগাকে বলি, ডাকাতি ছাড়তে, ভাল মানদ্ব হতে, খেটে খেতে—।’

মালতী হাউমাউ করে, ‘আমি কী কম বলি—শুনলে ত। একটি ভাই বটে, কুখ্য বেষোরে মরবে তার ঠিক-ঠিকানা নাই—কথা যদি শোনে।’

‘শুনবে। ঠিক শুনবে।’

মালতী বলে, ‘ঘরে কুছ নাই। ভাবলম্ যদি কিছ রেখে থাকে। তা মিছে কথা তুমি বল না। চাঁল দেখি, যদি কুখ্যম্ জুগাড় হয়।’

মালতী চলে যেতে অটল ভাবে, কিছ দিলে হত। কিন্তু তার অবস্থাও তো দু’ দু’।

ভোলাদের ঘরে খেয়ে এসে অটল অবসন্ন বোধ করতে থাকে। ভোলা আবার খাঁচরে খাঁচরে জানতে চেয়েছে, সে তেমন সাড়া দেয়নি। বাতাস দিচ্ছে। জ্যোৎস্না ধারার ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। দাওয়ার ঝিম হয়ে বসে থাকার পর ঘরে ঢোকে। ভোলার মায়ের রান্নার হাতাট চমৎকার। মাছের ঝাল ডিঙলের তরকারি, কলাইয়ের ডাল, তেমন তেলমশলা নেই, কিন্তু কী সুস্বাদুই না লাগে। খেতে খেতে সে কত প্রশংসা করে। আজ একটাও কথা বলেনি। বৌদি কী ভাবল কে জানে। আসলে কপালের শরা দাপাচ্ছে। চিন্দুর অবিবাসী মদুখটা চোখের সামনে থেকে সরেছে না। এলোপাতাড়ি ভাবনার সে যেন স্রোতের মদুখে কুটোটির মত আছাড়ি পাছাড়ি খাচ্ছে। ঘুমও আসতে চাইছে না। তবে অটল ঢের পায় না, কখন ঘুম নেমে যায়।

ববা শরীরের নির্বিড় ছায়াছন্নতা পড়েছে সবাকজুড়ে। বর্ষাগোধের ভূর-ভুরানিতে প্রাণীকুল, উদ্ভিদ ঘর-বদ্বার, কাঠ-খড়, মাঠ-ঘাট পদুকুর-ভোবা পর্যন্ত ঢের পেয়ে গিয়েছে আবহ মণ্ডলের ক্রিয়ার রসসিঁহতা ক্রম প্রাবণ এনে দেবে। এই মদুখীনতার ছোপ অঁকা হয়েছে শূকো ঘাসের চাবড়ায়, গাছগাছালির তুষাতুর ডাল-পালায়, কোপে-ঝড়ে। কাল সন্ধের পর বৃষ্টি নেমেছিল। রাতে বৃষ্টির বেগ কমতে অটল শুনতে পাচ্ছিল চারিদিকে বিপদল নিগ্রখনির এক উৎসব। ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে বর্ষার বিচিত্র পোকাদের যেন সঙ্গীত নিকরীর্ণ। অন্ধকারে সবাই জেগে। শব্দ দিয়ে জানাচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব। কোথায় থাকে বর্ষার এত পোকামাকড়! ঘাসে কোপে-ঝড়ে? অটল তাদের সবার নাম জানে না। রঙ-বেরঙের নানা

আকৃতির পোকা—চমৎকার হৃৎস্পন্দ আবার বৃদ্ধ একটি। হাতের পাতার রাখতে ইচ্ছে করে। কুলের মত ছড়িয়ে থাকে সব ঘাসের বৃকে। অন্য সময় এরা কোথার বার। করে বার, তারপর আবার বেঁচে ওঠে।

অটল ভাবে, প্রকৃতির এই নিয়ম। জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রে আবর্তন। চিনি কী কোথাও জন্ম নিয়েছে? চিনির উপর ক্রোধ তার ডিকে হয়ে গিয়েছে। যে শোক নিজের জনক হীনতার, যে গ্লানি তার দাম্পত্যজীবনকে মনে করিয়ে দিয়েছিল বালির ঘর নষ্টীতীরে, তা মনে হয় সব নয়, তার মধ্যে প্রাণ ছিল, তাপ ছিল, আনন্দ ছিল। সে অনায়াসে ক্ষমা করে দেয় চিনিকে। যা পেয়েছে তাকেই ছাতার মত মাথায় নিয়ে অমন অগ্নিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। বৃষ্টিও গড়ে নেয়। মেরেমান্দ্র সন্তান চাইতেই পারে, এ তার ধর্ম। সে বিতে পারেনি বলে অন্য পুরুষের কাছে গিয়েছে। ডিলর প্রতি তার যে আকর্ষণ তাও এক ধর্ম। এতে চিনির উপর বিশ্বাসঘাতকতা হয় না, এতে সেই প্রেম সেই স্নেহ মিথো হয়ে যায় না।

কিন্তু ডিল। দেখা করেনি বলে মৃদু ঘ্রিণে নেয়, তাকে দেখে অনাটিকে হাঁটে। কষ্ট হয় অটলের। সাহস করে ওর কাছে যেতে পারে না। অশ্রু রাতের বিছানায় কিংবা অন্য অবসরে, কাজের ফাঁকে অদৃশ্য ডিলর বারবার উপস্থিতি। বিছানায় শুয়ে শিরশির করে শরীর। স্পর্শস্নেহের আম্বাধন চায়। কামনার বেগ রক্তধারার অস্থির অশ্বগতিতে ছুটে যায়। ক্লুরধান শরীরজমিন কাপায়। রক্ত কামসমুদ্রে আথালিপাতালি জেউ দেয়।

এমনই এক অবস্থার সে যখন রাতের বিছানায় জাগর, তখনই কপাটের শিকলি ঝড়ে। দরজা খুলতে ডিল। ভেতরে ঢুকে বলে, 'বন্ধ করে দাও।' কোলের ছেলেকে অশ্বকারে ঠাওর করে অটলের তালাইয়ের উপর শুইয়ে দেয়, বিমূঢ় অটলকে সরিয়ে দরজা বন্ধ করে, 'আলা জালাও। দেখতে পেছি না।'

'ভূমি?'

'হ্যাঁ। আমি। শ্রুধোনের কী আছে। দেখতে ত পেছ। দেয়শালাই আছে ত।'

'হ্যাঁ।'

'তাহালে লক্ষ ধরাও।'

অটল লক্ষ জালে। লালচে শিখাটির মত সেও ছোলা খায় ডিলর ওপর চোখ রেখে। ডিলর কপালে গোল টিপ, চিকন মৃদু, বৃচোখ ভরা ধীরস্থ, গারে ছাপা শাড়ি, মাথার ডাঙা খোঁপা কঁধের দিকে ঢলে, ব্রাউসের ফাঁকে উন্নত স্তনের আভাসিত

ঐশ্বর্য, রূপের সরু হার তার উপর ঐশ্বর্য রেখা হয়ে আছে। বিহানার বসেছে।
ঠোটে হাসি। লক্ষের রক্তিম শিখাটির মত অটলও স্থির হতে পারে না। পুরুষ
রক্তের ধর্মে তার শিরা-উপশিরা ক্রমশঃ অগ্নিময় হয়ে উঠতে থাকে।

ডাল কেন মন বোকার বাড়ি জানে। কিংবা এও বিধাতার কারসাজি। নীরবতাও
কথা বলে, ডাল অনারাসে যা পড়ে নেয়। এবং দ্রুত ছেলেটোর অস্তিত্ব বাধা হতে পারে
এমন বোধে বলে ওঠে, 'কী করব। ছেলেটাকে কুখা ফেলে আসব বল। তবে ঘুমিয়ে
কাদা উ থাকাতে অসুবিধে নাই।'

অটলের পলকহীন চাউনি, রক্তে আগ্নেয় আলোড়ন। তাতে ইন্ডন জোগায় মেরে-
মানুষের অম্লভূত গন্ধে ভরা এই ঘর। নেশাচ্ছন্ন অটল অনদ্ভব করে ঘরের
পরিপূর্ণতা। রাত্তিরে তার ঘরে কেউ মেরেমানুষকে দেখে ফেলতে পারে এমন লক্ষ্য
মনে ঠাই পায় না, ডাল হঠাৎ কেন ভাবনাও আক্রমণ করে না—বু'চোখ ভরে
সে দেখে।

'দেখা হয়েছে আমাকে।' ঠোটে হাসি যেন কামরাঙা ফুল ঝরায় টুপটাপ।

ফু' দিয়ে লক্ষ্যটা নির্বিয়ে দিয়ে বলে, 'কী গো, কথা বলবে না। চল যাব।' ডাল
উঠে দাঁড়ায়, হাত ধরে অটলের বলে, 'ঘরে বসাতে হবে নাকি।'

অটল বসে। হাত ধরায় স্পর্শ ঘনিষ্ঠতার অবধিগত আকাঙ্ক্ষা ভেতরে জোরাগো
দাঘাত হানে। সর্বত্র উন্মুখ হয়।

'ভরে মরে গেলে। কেউ যদি আসে, তার লেগে। কী গো কথা বলবে নাই?'

'কী বলব।' অটলের কাঁপা গলায় শব্দগুড়ো বৃষ্টি ঝরে।

'হাবু তাহলে কথা ফুল।' ডাল সরে আসে, চাপা উচ্চস্বরে, ঘনিষ্ঠ গলায় বলে,
'মেরেমানুষ রাতে ঘর ছেড়ে পুরুষের ঘরে ঢুকে আশ্রয়ের লেগে, বাঁচার লেগে।'

'কী হয়েছে? ঘর থেকে চলে আসতে হল কেন?'

'ফনের লেগে।'

'ফনে কী করেছে?' কানবৃত্ত থেকে নারীর অসহায়ত্বের ঘণ্টা অটলকে বের করে।

'ফনে আজ জিদ ধরেছিল। সম্বন্ধে মদ্যে ঘরে ঢুকে বলল,' থাকবে রাতে।
উর সঙ্গে শোতে হবে। না করব কী। শুনবে না। বলে, লাও একডুং সাজগুজ
কর। সাজতে হল। দেখছ ত বাহার। তখনই মাথাতে বৃষ্টি এল। বললম্
গলাতে কিছু না ঢেলেই। আমি একডুং মদ খাব। ওমনি ছুটল আনতে। সেই
কীকে ঘরে কুলদুপ এঁটে চলে এলাম।'

এমন নিশ্চিত মেরেমানুষ বলে কেন গল্পকথা শোনায়, তার নয় অন্যের।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কাপট চিহ্ন নেই। শোনামাত্র কাকুনি খেয়ে অটল পূর্ণ
সচেতন, ধর্মাত্মক বোধে আগ্রহের প্রতি কামপ্রবৃত্তির দাসত্বে সেও যেন লজ্জার কিংবা
সহস্র চক্কুর ধমকানিতে কুঁকড়ে চায়।

‘কী থাকতে দিবে ত।’

‘নিশ্চয়ই। কিন্তু ফনেকে এত সাহস ত তুমিই দিবেহ!’

‘দিতে হয়। নইলে বাঁচা যায় না। তুমি ও দেখেও দেখ না, খোঁজ লাও না।’
কাচের চুড়িপরী নরম হাতের চাপ দেয় ডালি অটলের কাঁধে। উচ্চ শ্বাস ফেলে।

রমণীর শ্বাস গন্ধ স্পর্শচাপ অটলের পেশীকে আবার জাগিয়ে দেয়। হিম-
ধাতাসের যে কাপট তার প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে দিচ্ছিল তা আবার তাপ পায়,
কৌকিলান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত হয়।

‘বোঁশ খোঁজ নিলে রাগ হত তোমার।’

‘হায় কপাল এই তুমি আমাকে বুঝলে।’ শব্দ করে কপাল চাপড়ায় ডালি।

অটল চের পায় না কখন তার হাত বেঞ্চন করে যুবতীর শরীর। অন্ধকারে যেন
ফুলের মত, নরম ওঁড় গন্ধময়, মায়ু এবশকারী—আকর্ষণ কামআতুর পুরুষ করে
দেয় তাকে। সে ডালিকে আকর্ষণ করে, পেষণে নিজের সঙ্গে মেগাতে চায়। অশ্রুট
লম্ব করে যুবতী। তারপর পেলব লতার মত জড়িয়ে যেতে থাকে। অটলের মৃদু
নেমে আসে কাঁধে, গলায়, হাতড়ায় ঠোঁট, বাগ্র হাত ছোঁতে বুকের দিকে। ভরস্কর
বাস্ততার চেতনায় শব্দ, সূঁচের দিকে ধাবিত হওয়ার অদম্য স্পৃহা। কামগ্রাসী
ধর্মানিতে উচ্চ শ্বাসপাতের মধ্যে ডালিকে সে দু’হাতের ধারালো বন্ধনে টুকরো করে
দিতে চায়।

ডানা ছড়িয়ে পাখির ওড়ার মত ডালি ছটফট করে, ‘শুন—শুন—আহা ছাড়,
ছাড়।’ তারপর অমান্য পুরুষকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ফেলে দেয়, ‘তুমিও একট ফনে।
আমি চিঁচাব।’

আলগা হয়ে যায় অটলের হাত। কামবন্ধ্যার প্রবল বেগ যেন পাথরের দেওয়ালে
ধাক্কা খায়। ভাঙার আশঙ্কান শব্দ দেওয়াল মূহুর্তে মূহুর্তে দেয়। অশ্রুত স্থিরতার
খড়্গ অসহায় বোধ করে সে। যেন বোঁটা আলগা পাতা, যুবতীদেহ নয় তার পাশে
অন্ধকারে পড়ে আছে কাঠ, খড়্গ কিংবা মূর্তিকা খণ্ড।

ডালি টের পেয়ে যায়, ‘ভর লেগে গেল ত। তবে পাবে আমাকে। কিন্তু তার
আগে কথা দিতে হবে।’

কী কথা জানার কৌতূহলও জাগে না। এ কী করছিল সে। অনুশোচনায়

বেদনা গাঢ়ত্ব সে আত্মত হয় ।

‘জগাকে মনের সঙ্গে বিষ দিতে হবে । যেমন আমার সোনারমীকে দিরাইছিল আর কী । তা বাবে আমাকে লাও । কথা দিলেই আমি টু’ শব্দ করব না ।’ ডলি স্তনচাপ দেয় পিঠের ঘিকে । গলার কাঁধে উক শ্বাস ফেলার সঙ্গে চিবুক বসিয়ে রাখে ।

কিন্তু এখন অটলের বেহম্ন ঘূর্ণিঝটিকা বিধ্বস্ত । যেন তাকে উপর-নিচ নাগ্নরখোলার চরকির বনবনানিতে আবর্তিত করে ঝাঁড় করিয়ে দিচ্ছে । মস্তিষ্কে অব্যব অক্ষয় ধর্ম । বলে, ‘আমাকে অধর্মে ফেলো না গো ।’

‘অধর্ম কিসের । পাপী শাস্তি পাবে ।’

‘তুমি ঘর যাও ।’

‘আমাকে চাও না তুমি ।’

‘ধর্ম আছে জগার বিচের সে করবে । তুমি আমি কী !’

‘ধর্ম মানুষের হাত দিলে করায় । তুমি ধর্ম মান । তুমিই শাস্তি দাও । ফনে বলোছিল শাস্তি দব । কিন্তু না উ লয়, তুমি—তুমিই পারবে ।’

‘আমি পারব না । তুমি ঘর যাও ।’

‘বাবার লেগে আসি নাই ।’ ডলি এবার দ্ব’হাতে জড়ায় পদ্রুপকে ।

গ্রহণের কোন উদ্যম নেই পদ্রুপের । রক্ত ভয়ে শীতল । বোধে নারীশরীরের নরম উক স্তনের চাপ, বাহুলতার রোমাঞ্চ, কামনারিস্ত ওষ্ঠের লালা, ঘনশ্বাসের কাম-তরঙ্গ যেন বার্ষিকতার পাথরে প্রতিহত হয় ।

‘কী হল । ঠান্ডা মেরে গেলে । লাও—আমাকে লাও ।’

অটল শব্দ শৈত্য থেকে গভীরতর গৈত্যে ডুবে যেতে থাকে ।

‘তুমি আমাকে চাও না ?’

‘চাই । কিন্তু এমন করে নয় । তুমি শাস্ত হও ।’

‘হই কী করে গো । ভেতরে যে ঢেক ছালা ।’

‘তুমি চুপটি করে বসো । এখন রাত ; সকাল হোক সব ঠিক হয়ে যাবে ।’

‘না যাবে না ?’

‘হারাকে তুমি খুব ভালবাসতে ?’

‘জানি না । তবে তোমাকে ভালবাসি ।’

‘আমার কথা এখন রাখ ।’

‘রাখলে চলেবে কেনে । রেতে বখন এসোছি— । তুমি আমার ছালা মেটাও ।’

‘বলছি তুমি ধুমোও ।’

‘তুমি পূরুষ লও । না, তুমি পূরুষ লও ।’

বাইরে অশ্বকারে ব্যাঙের ব্যাঙের ব্যাঙের, বর্ষার পোকাঘের বিচিত্র নানান ধ্বনি বয়ে যাচ্ছে । অটলের কানে তার সঙ্গে বাজে ঘরের মধ্যে মেয়েমানুষের ফূঁপিয়ে ফূঁপিয়ে কাহ্না । বাইরের শব্দ বাইরে থাকে, কিন্তু কাহ্না তার শরীরের মধ্যে সমস্ত শিরা-উপশিরাময় বয়ে যায় । শব্দহীন তার নিজস্ব কাহ্না ডালিকে বলতে দেয় না তুমি কে’ব না । কে’ব না । অমানিশার অনন্ততা নিয়ে ভাঙাচোরা অটল বসে থাকে, সঙ্গে থাকে নিদ্রাহীন সহস্র চক্ষু ।

অটল বকনাটার লোমে হাত বুলোয়, ভাবে, না বেঁটি এ যাত্রা বেঁচে গেল । কেমন চেকনাই হয়েছে । নতুন ঘাস, বৃষ্টি চতুর্দিকে তরতাজা ভাবে এনেছে শূন্যে এলাকার, মানুষ অন্য প্রাণীরও সেই ভাবের চারায়নতা । ভাবে, বকনাটা গাই হলে দাম ঢের । মূল্য বাত্বর । কিন্তু তার জন্যে ঝগট কম নয় । অত লাভে তার কী দরকার । একা মানুষ ।

একা মনে হলোই পূর্ণতার দাপট । চিনির রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর চাবুক শাসানি মনে । ডালি ছায়াছন্ন সবুজ বৃক্ষ হয়ে মাথায় থাকে, রোষ আড়াল করে, পাতার নরম স্পর্শে আবার গড়ার জন্যে আকুলিত করে মন । কিন্তু ডালির অমন নরম চোখের চাউনি, চোখেমুখে লাগণের সরলতা, তার মধ্যেই যে নাগিনী লুকিয়ে রয়েছে । ছোবল দিতে চায় । বিষখালি টলমল করছে । অটল যে কী করে ।

রাতে তার ঘরে আসার পর ভোর ভোর বেরিয়ে গিয়েছিল । বৃদ্ধি বোধ নেই । সেও যেতে পারেনি । ভাবে, ঋক্ম তাকে রক্ষা করেছে । সে রাতের ঘটনা কেউ না জানালেও আকাশের হাজারো দেবতার চোখ এড়ানর জো তো নেই, তারা দেখেছেন । ডালিকে সে ভালবাসে । সাঙা করার পর মেয়েমানুষ তার হবে । তখন বেহ পেতে পারে, জীবনম পালন করতে পারে । তার আগের সম্পর্ক ধর্মের চোখে পাপ । তবু ডালির তাকে কামনার মধ্যে সন্ধ্যের একটা বাঁজ থেকেই যাচ্ছে । সে তো চিনিকে ভুলেছে । সব শোনার পরও ক্ষমা করে দিতে পেরেছে । ডালি তো তার স্বামীকে ভুলতে পারেনি । এখনও প্রতিশোধস্পৃহায় শিখাটি জ্বলছে । ভালবাসা না থাকলে এটা হয় ? অটলের বৃদ্ধিতে বোধে ব্যাপারটা বড়ই জটিল । কোন ব্যাখ্যার ব্যাঙের সামর্থ্য তার নেই । খোঁরাটে বোধে সন্ধ্যহটাও অজস্র এলোমেলো বিশ্ব কোন আকৃতি নিতে পারে না ।

‘কী হল ! এসেছি কতকখন । বকনাটার গা থেকে মূখ তুলছ নাই । কাজক্ম কিছ্ নাই ?’

অটল চমকায়, ‘তুই ! তোর নামে যে হুঁলিয়া । পালিয়ে যা ।’

‘হুঁলিয়াই আসে আর যায় । আমি ঠিক থাকি ।’ জগার ঠোঁটে সিগারেট ধলে । দাওয়ার বসে বলে, ‘জান শাখার জ্বর । দেমাক কত । আপেল আঙুর নিয়ে গেলম্ ওষুধের লেগে টাকা ধরতে গেলাম, ছুঁড়ে ফেলে দিলে । বলে, পাপের পরসার ফল ওষুধ খাবে না ।’ অসহিষ্ণুতার ছালা নিয়ে তীব্র ক্ষোভে জগা বলে চলে, ‘টাকা পরসার আবার পাপপুণ্য কী ! ওতে কী লেখা থাকে । শালা ডাকাতি করতেও হিম্মত লাগে, মাগনা কেউ হাতে তুলে দেয় না, খার্টনি লাগে, বর্দ্ধি লাগে । আর পুণ্য করে ধন হয় না । সব শালা ডাকাত ।’

‘কে “ডাকাত কে ভালমানুষ বিচের করার তুই আমি কে ! তবে হ্যাঁ বলতে পারি শাখা ভালমেয়ে বটে । ভালবেসে দিয়েছিচ্ছ্ ছুঁড়ল কেনে ? তুই অন্যায়ের ধন এনেছিচ্ছ্ বলে । গায়ের ঘাম ফেলে খার্টনিতে রুজ্জগার কর—ঠিক লিবে ।’

‘আমি কী আবার রিক্সা টানব । তোমারও দেখাছি—হুঁ ।’

‘রিক্সা টানতে যাবি কেনে ? অন্য কাজও দেখ । তবে রিক্সাটানা কী খারাপ কাজ বটে । যাক গো, ভিন্দু কাজ বলতে পারি । তোর পসন্দ হবে ত !’

জগা সিগারেট টানে । উত্তর দেয় না । তবে শোনার জন্যে অটলের উপর পলকহীন চোখ ফেলে রাখে ।

‘বড় পদকুরের ধারে কাপ্তান পাল ভালগাছ কেটেছে । গোড়াট পড়ে আছে । মাটি থেকে তুলে দিলে পনের টাকা দেবে । আমাকে বর্লাছিল । আমরা আঠার টাকা চেয়েছি—রাজি । ভোলা আমি—সব বাগালরা আর কী । তা তুই ওটা তুলে আঠার টাকা নিতে পারিস্ ।’

জগা উত্তর দেয় না । সিগারেট টেনে যায় । চোখ আকাশের দিকে ।

‘ভাবিচ্ছ কী । কাজটতে কুড়ুল কোদাল নিয়ে লেগে যা । পারবি ত ?’

জগা চটে ওঠে, ‘খুব পারব । কিন্তু কেনে ? শাখার এত দেমাক কিসের । কী ভেবেছে । জ্বর আছে কী না দেখতে কপালে হাত রাখতে পর্বস্ত দেয় না ।’

‘দেবে—দেমাকও থাকবে না । ওই আঠার টাকা বলবি কী করে পোল, দেখাবি শাখা হাত পেতে নেবে ।’

‘তুঁমি ওকে চেন না ।’

‘চিনি বলেই ত বলছি ।’

‘কিন্তু তোমাদের কাজ আমার নেওয়া ঠিক হবে না।’

‘আমাদের কী বাধা। বাগালি ত ছেড়ে দিছি না। তাহালে চল বড় পুখোর।
গরু খুঁলে আমিও যাব।’

জগাকে যেন জেদে পায়। অটলের কথার মধ্যে এমন কিছু থাকে কিংবা
প্রত্যাখানের প্রণয়নাত্মক চর্চা তার ঘরের গা কাড়া দিয়ে উঠে দেখান সে সব পারে,
তাকে মাটির গর্ত থেকে ভালগাছের শেকড় গুঁড়ি তোলার আঠার টাকা উপার্জনের
দিকে ধাবিত করে।

অটল খুশী হয়। ভালবাসার মেয়েমানুষের অন্য মানুষ অসাধা সাধন করে।
জগা করবে এটা কী নতুন কথা, সে চিন্তির জন্যে করেনি। থাক চিন্তির কথা।
একটা ছেলে পেটে নেবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। চিন চিন করে কাটা
জারগার নুন লাগার ছালা। অটল ভাবে, ডলির জন্যে সেও তো অনেক কিছু
করতে পারে। কিন্তু মেয়েমানুষ যে তাকে ঠেলে দিতে চায় নরকের দিকে।
আহা মানবজীবন বড় মূল্যবান গো। ভাগ্যের কথা। গুয়ের পোকা হয়ে যখন
জন্মাণ্ডনি, গু ঘটিবে কেন? আর জগা—কে বলে ভালমানুষ ওর মধ্যে নেই? আছে-
আছে-দেখা যেত না। এখন দেখ সব। শাখা তাকে ভাল করতে বলেছে। কিন্তু
শিরীষের বাণে কাণ হরেই তো ভাল হতে হচ্ছে। জগা ভাল হোক। দুর্নিয়ার
সবাই ভাল হোক। আকাশের দেবতার কত কণ্ঠ। দিনরাতির নজর ফেলে রাখতে
হয় হাজারো চোখে, বিশ্রাম নেই—তেনার বিশ্রাম জুটবে

জগাডাকাত কুড়ুল ফ্যাবড়া নিয়ে একা একা বড় পুকুরের ধারে তালের গুঁড়ি
ভুলছে এ এক সংবাদ বটে। লোক জড় হয়ে যায়। কান্না আসে। তারই কাজ।
তা বলে জগাকে দিয়ে করান। বলে, ‘আরো তুমি করছ কী জগা! একী তোমার
কাজ!’ ডাকাতকে ভয় থেকে তার তোয়াজের চেষ্টা। না জানি কোন প্রতিক্রিয়া
হয়—এর উপর ফলে যায় আঁধার রাতে। সাঁদুখ সব চোখই। নিশ্চয় এর মধ্যে
রহস্য আছে। জগা মূনিবাগির করার পাঠ নয়, অন্য উদ্দেশ্য আছে। ভিড়টা
জগার দাবড়ানিতে মেলা বসাতে পারে না। গোবিন্দ ‘এদিকে কাট ওদিকে কাট’
বলতে যেমো মূখে জ্বলন্ত চোখ জগা তাকায় শব্দ। সাহায্য করতে ফনে এগিয়ে
এলে বলে ‘সর শালা।’ অটল ভোলা বাগালকুল উবু হয়ে বসে দেখে শব্দ।
জগার গারে ঘাম করছে। মাথার রক্ত ফুল আশ্বালিত হচ্ছে, সমস্ত পেশী থেকে
হিটকে পড়ছে বিদ্যুত। বিশ্রাম নেই, শ্বাসের শব্দ বেড়ে যাচ্ছে। একটা মানুষ

লড়াই করছে মাটির সঙ্গে, তার গর্ত থেকে তালের শিকড় গুঁড়ি নয়, অমূল্য কোন সম্পদ দাবি উঠবে।

অটল ভোলাকে ফিসফিস করে বলে, 'বাজী হার। টাকা দিয়ে দিবি।'।

ভোলা বিস্ময়াহত। কথা বলে না।

জগার গুঁড়ি ভোলা, আঠার টাকা নিয়ে যাওয়া যেন অটলের চারপাশে এক চমৎকার স্বপ্নের দৃশ্য রচনা করে! সে দিবি! ভাসে সাধা ফেনপূজা মেঘের মত। বাধাহীন অকাশ মাটি তারার আলো, চন্দ্র সূর্য এই পৃথিবীর বৃক্ষ লতাগুল্মাদি, দীর্ঘ, নদীর উপর আশ্চর্য মায়াময়তার সে পক্ষ বিস্তার করে। পক্ষের ছায়ার বসন্তভেজা হৃৎকম্পিততার সে এঁকে নেয় জগা শাঁখার এক মধুর দৃশ্য। শাঁখার জ্বরপ্রপ্ত কপালে হাত রেখেছে জগা। মেয়ের শূন্যনো ঠোঁটে হাসি, শরীরের সব যন্ত্রণা বিমোচিত হওয়ার স্বপ্ন! ভোলা বিষ্ঠা পদাইয়ের সঙ্গে বাজীতে জিৎ কিন্তু ওরা মানতে চায় না। তবে তার জন্যে অটল তর্ক করে না। ওরা আরও কাজ দেখবে। দেখুক, অটল জানে সে জিতে গিয়েছে।

সহবেবমাণটার ভেঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁরে অটল, জগা নাকি তোর কথায় ওঠে-বসে। কী মস্তুর পড়লি বল দেখি।' জিজ্ঞাসাটা আরও অনেকের। অটল তার নিজস্ব ভঙ্গীতে হাসে।

অটলের অহংকারটা ভেঙে যেতে দেয়ী হয় না। ভুল তার। লোকের সন্বেহই সত্য! সন্বেবেলার জগা আসতে তার ঔৎসুক্যভাৱে মুঁছিয়ে দেয় ওর ক্ষুধা কথা। শাঁখা ভাল আছে! আঠার টাকা নিয়েছে সব শূন্যে। বলে, 'শাঁখার কথা ছাড় তো। শালা। তোমার কাছে আসছি শানে ফেন বললে অটলবাগাল মার্গ। বটে—মাগীর পারা টান আমার তোমার উপর। তা আছে, বৃদ্ধিতে পারি। তা নাহলে তোমার কথা শূন্যে তালের গুঁড়া ভুলতে যাই—আঠার টাকার লেগে অত্র শ্রম করি—শালা। একটু মেয়ের লেগে—।' জগা মদ খেয়ে এসেছে। মদ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভেঁতো মদের পচানি গন্ধ। পাজামার উপর পাজাবি, মাথায় রুদ্ধ চুল। ফোভের ধোলা তার সারা শরীরে।

'ভাল কাজ করেছিস। ফেন ভাল লয়। তোকে কুশিক্ষে দেয়।'

'তুমি সূর্যক্ষি বিছ।' জগা বিদ্রুপের টান মারে। তারই ঝনঝনানি নিয়ে বলে, 'তুমিও তো ডলিবাঁদির সঙ্গে মজ্জছ। ফেনের উঁকে টান আছে, মাঝখানে তুমি।'

'ফেনের মতলব ভাল লয়।'

'মাগী করবে তার উপর খারাপ ভাল কী। সব বেটারও একই মতলব। তবে

হ্যাঁ আমি তোমার দিকে। ফনেকে কবে দিরোঁছি উকে আর জ্ঞালাবে না। তুমি সান্তা কর। আমি আছি।’

‘আমার কথা ভাবতে হবে না। তুই নিজের কথা ভাব।’

‘ঠিক বলেছ।’ মাথা অথবা নাচাতে থাকে বারবার জগা। বলে, ‘তার লেগেই আসা। তুমি আমাকে আঠার টাকার কাজ দিরেছ। আমি দশো টাকার দ্ব। বৃষবার রেতে তুমি ষেরূপে আমার সঙ্গে। ভয় নাই। ঘরে ঢুকতে হবে নাই, খালি মাল সরাবে।’

অটলের গলায় বিস্ময়াহতের আর্তি, ‘আবার তুই জেনেশুনে মরতে যাবি।’

‘মরাকে আমি ভয় করি’না। একদিন ত মরতে হবেই।’

‘তুই মরলে শাখার কী হবে।’

‘কাজের সময় মেরেমানুষের নাম করো না। তুমি যাবে কী না বল।’

‘যাব না।’

‘বাঃ এভাবে আমাকে কাজ করালে। আমি কাজ করতে চাইলে—না। বাহা রে বাঃ। দুনিয়া কেমন দেখ।’ জগা যেন মজা পেয়েছে।

‘মদ খেয়েছি, ধর যা। আর বকতে হবে না উলটোপালটা।’

‘মদ খেয়েছি, মাভাল লই। দিবা জ্ঞান আছে। জবাব দাও দাদা।’

‘তোকে ভাল কাজ বর্লোছি। তুই আমাকে অনায়াস করতে বলছি।’

‘তুমিই ত বল, ন্যায়-অন্যায় বিচের করার আমরা কে! কাজ ত বটে।’

‘আমি ওক করতে পারব না।’ বলেই অটল নীরব হয়ে যায়। কী বোঝাবে সে মাভালকে, ডাকাতকে। ভালমানুষ গড়ার আনন্দটুকু বর্বার এই সম্বা কেড়ে নিয়ে দুঃখের হাহাকারে ভারয়ে দেয়।

জগা কত কী বলে যায়। মানুষের উপর, এই পৃথিবীর উপর এঃ প্র ক্ষোভ তার, কোথাও শান্তি নেই, কেউ তাকে বোকে না, অলৈল বৃবতে চাইছে না ইত্যাদির শেষে বলে, ‘ঠিক আছে। আমার অন্য কাজ বার।’ নিচু খাদে গলা রেখে বলে, ‘তোমার কাছে কিছ, টাকা কিছ, জিনিস রাখব। কখন কী হয় বলা যায় না। ধরা পড়লে জেলের ঘানি টেনে এসে তোমার কাছে লুব। আমি জানি তুমি সর্বাংক ছিক ঠিক ফেরত দিবেই।’

‘আমি কিছ রাখবই না।’

‘আমি মরলে সব তোমার হবে। ফিরে এলেও ভাগ দ্ব। উঃ, ফেরার আগেই তোমার ভাগ। বৃকলে ইবার ডর লাগছে।’

‘পিতৃপ্রতিম রোহে অটল বলে, ‘ডর লাগলে তু যোঁছিস কেনে জগা ।’

‘আমি কী বোঁছি, আমাকে বেতে হচ্ছে । ষাক্ শুন, তুমি নতুন সংসার পাতবে, ষর করতে হবে, চালে খড় লাগবে । বোঁয়ের পিছাতে ষরচ আছে । তুমিও বোঁকে তো স্খ দিতে চাও । আর ডলিবোঁদিকে তুমি পাবেই ।’

‘তুই ভালমান্দ্ব হ । তারপর তোর সব কথা শুনব ।’

জগা এবার কিস্ত হরে ওঠে । দাওরা থেকে ছিটকে পড়ে উঠানে, ‘কোন শালা ভালমান্দ্ব ! গরীব বড়লুক দেবতার লীলা : দেবতার কাজকর্ম নাই । সবাই মায়ের পেট থেকে নাক্স হরে বোরিয়ে আসে, রাজা ভাঁখরি সব—ভাবাবে মান্দ্ব শ্বে বড়লুক হয় । আমি উদের ঘরে ডাকাত করি—কী অন্যায় করি । অটল-বাগাল তুমি আমার মাথা ষারাপ করে দিছ । শালা, খুন করতে পারলে তুমাকে শান্ত পাই, খালি নাচাও খালি জ্বালাও শাখার পারা । দ্বই ই সমান । বেঁধে আমাকে মারছ । পালাতে পারছি না, ঘরে ঘরে আসছি ।’

সম্বের আধার ঘনখে, আকাশের নিঃশব্দ নক্ষত্রকুল, নিঃশব্দ গ্রাম, বাতাসের অশ্শা তরঙ্গ কাঁপান স্বরপাতে সে ঘর্নিঝড় গড়ে নের । মদের নেশা কেটে গিয়েছে । তারপর ঘর্নির মতই বোরিয়ে যায় ।



বৃষ্টি । বৃষ্টি । সূর্যহীন দিন কৃষ্ণমেঘ ঘনভার অবিরল কান্নাধারায় ভাসে । অকুরান প্রকৃতি মান । খেড়ো চাল বেয়ে জল নামার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না, গাছের পাতা ঝরাশি থামায় না, ঢালু জমির জল নামা থমকায় না । ছেঁড়া ছেঁড়া নিচু সব জমিই জলাভূমি, তারমধ্যে চাষের কাজ, চাষী ক্ষেতমজুর চরম বাস্তব, সংসারের অন্য কাজ মূলভূমি । সবয় এবার দেবতা । পাখুরে জমিতে অতি বর্ষণ শূন্য ফলদায়ক, আগামীর সম্ভাবনাকে সোজার করে । এ সময় গবাদি পশুর চারণভূমি হয় অচাষযোগ্য ডাঙা জমি । বাগালকে নজরদারি বাড়াতে হয় । আফুড়ে বা বীজতলা গড়ে উঠেছে । সবুজের ডাক—অবলা জীব ছুটে গাবেই । গেলেই খোঁরাড়, জঁরমানা । গরু নিয়ে বর্ষায় হুঙ্কারে বটে । এই তো কাল থেকে আকাশ মৃদুতের জন্যে নীরব নয় । ডাঙরের বিন চলছে । বৃষ্টি বিরক্তিতে গরু ছাগল ঘাসে মূখ লাগাতে পারে না । সব গোয়ালবন্দী হয়ে আছে । বিকেলের ঘিকে একটু চকণা করতে অটল গরু খোলার কথা ভাবে । ভোলা এসে আপত্তি জানায়, ‘ছাড় তো । বেলা আর আছে নাকি । গরু খুলে নিয়ে যেতে যেতেই সন্ধ্য । আকাশ ছাড়ক, কাল সকাল সকাল খোলা হবে । রীথাবাড়া করলে ?’

‘সকালে থিছুড়ি করেছিলম । এককম সন্মাদ হয় নাই—পড়ে আছে । রেতে উঠেই খাব ।’

‘বড় পুখোরে মাছ বেরিয়ে গেইছে ভাসানে । সবাই ধরেছে । মা যেতে দিলে নাই । জুরে ভুগলম ত দুদিন । ধরেহ মাছ ?’

এ সময় এক উপার্জন হতে পারত বটে মাছ ধরা । মাঠে খালে পুকুর ভাসান মাছ । কিছু খন্দের কোথা । গোপালপুরের বাবুপাড়ার জলের দামে দিতে হয় । নিজেরা খাবে ; তা তেল চাই, উনুনের কাঠ চাই, মশলা চাই । বর্ষার কাঠ ভেজা, অল্প বাবস্থা হলেও উনুন ধরাতে চোখে জ্বালাবারি নামে । অটলের মাছে আগ্রহ নেই । বলল, ‘যা ডাঙর উনুনে হাত পা ঢুকিয়ে মরা আগুন জাগিয়ে রাখতে হয়, ভাত ফুটেই কাঁহিল, তা মাছ—’

‘জগা এসেছিল ?’

অটল চমকায়। সে বড়ই ভয়ে ভয়ে আছে। ডাকাতিতে যাবার কথা, তার কাছে টাকা গরনা রাখার কথা বলার সেই সম্ভার পর আর বেধা করতে আসেনি। আসার জো নেই। রামপুরে ঘোষালডাক্তারের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে প্রহরার পা গিয়েছে, ফনে ধরা পড়েছে। আশ্রয় করে দিয়েছে ওকে। জগা তারপরই ফেরার। ডাকাতির পর পুলিশ কুকুর এসেছিল রামপুরে। ধরা অবশ্য কেউ পড়েনি। কোন মালও পাওয়া যায়নি। কিন্তু থানার জগাকে ধরার খুবই তোড়জোড়। সবরে ঘোষালডাক্তারের কত প্রভাব প্রতিপত্তি, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ভাবসাব। জগা ধরা পড়বেই।

অটল ব্যগ্র প্রশ্ন করে, ‘জগার খপর আছে ?’

‘খপর থাকলে তোমাকে শ্রদ্ধা দিই। রাতবিয়তে তোমার ঘরে ঢুকতে পারে। খুব সাবধান। তালের গুঁড়া তুলাতে বললে ভাল হয়েছে ? হুঁ, ভাল হবে তাহলেই হয়েছে আর কী।’

‘নিজেই মরছে—ধরা পড়লে ত স্বীপ চালান।’

‘শালার আর বাঁচার পথ নাই।’

অটল বদ্বতে পারে না শুনে তার কেন কষ্ট হয়।

‘বেটা ঠিক বেহারে পালিন্ছে। না, সম্মে হল, ঘর ঘেঁছি।’

‘হ্যাঁ স্বর থেকে সব উঠলি, সাবধানে থাকতে হবে।’

ভোলা চলে যাওয়ার পর অটল নীরবে বসে থেকে। জগা কারও কথা শুনল না, আবার ডাকাতিতে গেল, তবু কেন যে এত উদ্বিগ্নতা ওকে ঘিরে, এখনও কেন যে ওর মঙ্গল চাইছে, কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে। অটল টের পায় না—সে ভালবেসে ফেলেছে।

চকায় রাতিবেলায় ন্যাক জগাকে ধরার জন্যে নিঃশব্দে পুলিশ ঘোরে এখন। মালতীর ঘর এসেছিল, হিম্বর্তম্ব করে গিয়েছে দু’দিন। তার ঘরে পুলিশ আসবে অটল এটা কখনও ভাবেনি। জিপগাড়ি রাস্তায় ধাঁড়িয়ে থাকে। ছোটবাবু সঙ্গে চার বন্দুকধারী। খাঁকি পোষাকের কোমরে চওড়া বেল্ট, রিভলভার, মাথায় হুঁপি, ভারী চেহারার ছোটবাবু। দু’চোখ জ্বলা, টান টান কাঠামো। অটল গাই দুইতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গাড়ি, পুলিশ দেখে সবাই কাজ ছেড়ে অটলের উঠানে। প্রশ্নহীন, বিস্ময়ভরা চাউনি। তো মানবজন নয়, পুলিশ দেখেই অটলের স্বপ্নপিন্ডে ভয়ের ফটল, তাতে হু হু বাতাস বেরিয়ে সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

‘তোমার নাম অটল?’

অটল মাথা নাচায়।

‘কে’তো জগা কোথা?’

‘জানি না।’

ছোটবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন, ‘জানিস্ না কী। তোর ত স্যাঙাত। আমরা সব খবর রাখি। তোর কাছে কবে এসেছিল?’

‘ঢেক দিন আগে।’

‘ঘোষালডাক্তারের বাড়ি ডাকাতের পর তোর কাছে কী কী রেখেছে বার কর।’

‘কিছু রাখে নাই।’

ছোট দারোগা দাবড়ে ওঠেন, ‘মিথো কথা।’

‘আমি মিথো বলি না।’

‘বুঝিষ্ঠর আমার। খর সার্চ হবে তোর।’

পুলিশ ঘরে ঢোকে। চিনের বাক্স, মাটির হাড়ি, তালাই এলুমিনিয়ামের খালা বাটি গ্রাস, ওঁদিকে কাঁথার পুঁজি। পুলিশ আছড়ায়, বাইরের দিকে বোরিয়ে আসে খালা বাটি। শব্দ তারই শব্দ। জনতা শব্দ, ছোট দারোগা নীরব, অটলকে ওঁকি। চোখে দেখছেন। অটলের দৃষ্টি চোখে অসহায়ত্ব, শব্দহীন, জীবনেরও বাকি সাড় নেই।

পুলিশ দৃষ্টি জন বোরিয়ে আসে, ‘কিছু নেই স্যার।’

‘এই কোথা পুঁজে রেখেছিস্?’

অটলের মৃদু দ্বিধে ভয়াত্মক বোরিয়ে আসে, ‘কী।’

‘ন্যাকামো হচ্ছে।’

‘স্যার, মৃত্যুর কথাতে হবে না। দেখুন—।’ বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পেটে আঘাত করা ঘা দিতেই অটল আতঙ্কিত শব্দ করে পড় যায়।

‘আমি কিছু জানি না বাবু।’ অটল ঘষটে ছোটবাবুর সবুট পা ধরতে যায়।

ছোটবাবু বসে সমেত পা দিয়ে ঠেলে দিলেন। উল্টে পড়ল অটল। বিশাল হয়ে উঠল তার চক্ৰকর খাঁকি পোশাক, বেল্ট, পেতলের তকমা, অগ্নিউপারী রিভলভার, ওলুচ চোখ, শক্ত চোয়াল, পুরু ঠোঁটের গুঁফো মুখ সবই জিহ্বাংসাপূর্ণ। টের পেলে বন্দুর উপর ভারী পারের চাপ। আতঙ্ক বিহীনতার রক্তহীন, প্রাণশক্তি শেষ বিস্মৃতে পশ্চপায়ে জলের মত টলমলমান, প্রবল শ্বাসকন্ট, পাজিরা মট্-মট্ করে কাঁটির মত ভেঙে যাবে, তারই শব্দ শোনার বর্ধমান চাপের বন্দনা উদ্ভ্রমতা, আকাশ নেই বাতাস নেই

শব্দ নেই, ভরস্কর বৈভাষ্য নামছে, চাপ দিচ্ছে। অটলের পেট থেকে বৃদ্ধি নাড়িছড়ি।
কলার দিকে শব্দ বেরিয়ে আসতে চায়।

‘বল্। বল্ কোথায় পড়ে রেখেছিস্।’

আরশোলার মত উলট খাওয়া শরীরে বৃট পা, অটল মাথা শব্দ নাড়ায়। মৃৎ
হাঁ, বিস্ফারিত চোখে বমন অনুভূতি।

ভিড়ের ভেতর থেকে ডলি বেরিয়ে আসে আলুলায়িত চুলের ঝটিকা হয়ে।
কিশাল ডানায় চন্দ্র কঠিন আঘাত হানার আক্রোশ নিয়ে ধাক্কা মারে ছোটবাবুকে।
চৌঁচিয়ে ওঠে, ‘ছাড়। ছাড়। মান্দ্য নাকি শূন্যের বট।’

ছোটবাবু ডলির দিকে ঘুরে দেখে। গায়ে ডোরা শাড়ি, দু’ চোখ আগুন,
মেরেমান্দ্য যেন সাপিনীর মত হিঁস্‌হিস করছে, চেরাজিত ঝুলছে, ছোবল মারার
জন্যে টান টান বিদ্যুত রেখা, খড়ম ছাপ রঙীন ফনা। ছোটবাবুর ভয়ের প্রচ্ছন্নতা
স্বরে, তুই আবার কে?’

‘দারোগা বলে মাথা কিনেছে। উ চুর না ডাকাত বটে।’

‘সরে যাও। সরে যাও এখান থেকে।’

‘সরব কেনে? সরব আর মারবে?’

‘কে হয় অটলের? অত ঘরঘর।’ ছোটবাবু প্রশ্ন রাখেন শ্রান্ত জনতায়।

জনতা নীরব। পরস্পরের মৃৎ দেখে। ডলি বলে, ‘যেই হই। অন্যায় মারবে।
শুধোন গায়ের লোককে, গদ্যপালপদ্য যান, মান্দ্য ই কেমন বটে সবাই বলবে।’

জনতার প্রতিক্রিয়া পরস্পরের মৃৎ দেখা।

‘কী গো সব যে মৃৎে কুলদ্রপ এঁটে নাশ্য কথা বলতে পার না।’

ভোলার মা বলল, ‘বৃন ঠিক কথা বলছে। জগা ডাকাত বটে, ই ভালমান্দ্য।’
সঙ্গে সঙ্গে জনতার সোরগোল, ‘ভালমান্দ্য’, ‘বাগাল’, ‘জগা যদি আসে উর কাছে
ওর কী ঘোষ।’ ওদিক থেকে সরলাবুড়ি বলে, ‘ডাকাত ধরার মুরোদ নাই, ভাল
মান্দ্যকে টানাটানি।’ যেন জনতা কথা ফিরে পেয়েছে। পদলিখ ভর কাতেই
সবাই বলতে চায় একসঙ্গে।

ছোটবাবু পা ঠোকেন, ‘চূপ কর্। চূপ কর্ সব। চল্ থানায়।’

ডলি ঘিরে দাঁড়ায়, ‘না যাবে না।’

ছোটবাবু আর সাপিনী দেখছেন না, প্রতাপ চিড়বিড় করছে খাঁকি পোশাকে
ভেতর। ঠোঁট বেকিয়ে বলেন, ‘তোরও যেতে সাধ হয়েছে।’

‘সাধ না হলেও ত নিরে যান।’

‘কে তুই?’

‘আবার কে? মেরেমান্দুৰ বটি। ইখানে না বাঁড়িহে জগাকে বড়্জুন। ধরার মরোখ নাই, খালি ভালমান্দুৰে উপর তড়পানি।

একজোড়া সাইকেল আসে সরু রাস্তাটোৰ। পজায়েত সবসা গোপীনাথ আর প্রধান অকিনাশ। গোপীনাথের পাজামার উপর শাট, রোগাটে চেহারা, বিএ পাশ করেছে, নিজের জমি চাষ করে, কালো মূখে সরু করে কামান মূখ। অকিনাশ প্রায় পঞ্চাশ, গোলগাল চেহারা, তামাটে বর্ণ, সম্ভ্রম আদারকারী টাক, ওলটান কাঁচাপাকা চুল, মূখে গালে লাবণ্য এবং প্রেময়তা আছে। আগামী নির্বাচনে বিধানসভাতে দাঁড়াবে তার জমি প্রস্তুত করছে।

‘আরে ছোটবাবু—আপনি—কী ব্যাপার।’

ছোটবাবু এবার ধারোগাসুলভ ভঙ্গী ফোটান, শাসনকর্তা, সরকারের বাধা মান্দুৰ নির্বাচিত প্রতিনিধি তো ফুটুন্ হতে পারে—বিগলিত হন না মোটেই, ‘আবার কী। এই আপনার জনতা।’

‘কী করল জনতা?’

‘মান্দুৰগুলোকে এমন করে দিয়েছেন। কথায় কথায় এখন বিপ্লব করছে।’ ছোটবাবু অভিযোগ নয় হাসির মোড়কে তিন্তা ফোটান, ‘আসামীকে নিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছে।’

‘আসামী? কে আসামী? ডাকাতির?’

‘এই যে।’ ডাল চুড়িপরা নিটোল হাত বাড়িয়ে অটলকে দেখায়।

গোপীনাথ বলে, ‘সে কী অটল কেন ডাকাত হবে। ভুল করছেন ছোটবাবু। ও কোন অধর্মে থাকে না। ওর তো কথায় কথায় বাতিক ধম্ম আছে বলা। না, না। আমি চিনি ওকে।’

‘মান্দুৰ চেনা কী অতই সোজা। ওর নাম পাওয়া গিয়েছে। ডাকাতিতে না থাকুন্ শেলটার দেয়। একটু কড়কে দেখাছিলম্ দেহতো জগার সন্ধান যদি পাই।’

অকিনাশ বলল, ‘তবে যে বললেন জনতা বাধা দিচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, ওই কড়ানি দিতেই তো—।’

অকিনাশ ভিড়ের দিকে চোখ রেখে বললে, ‘আরে বাবলা তুই অতদূরে। কী হয়েছে। তুই এক মেম্বার—। ভোট দিলে তোকে দাঁড় করিয়েছে।’

বাবলা এগিয়ে আসতে আসতে বলল, ‘শেনেই তো এসে দেখি ছোটবাবু অটলের বুক পা দিলে বাঁড়িহে আছেন। ডালবো ভাগ্যাস্ রুখল।’

অবিনাশ হুঁতে বিস্ময় রেখা নিয়ে বলে, 'সে কী ছোট্টবাবু, আপনি মা কালী হয়েছিলেন, অমন নির্দোষ একটা মানুষকে শিব করে।' মাথা দোলায়, 'পাবলিক তো এটা মেনে নেবে না। জগাকে নিয়ে যা খুশী করুন—কিন্তু অটল ধর্মভীরু, শাস্ত, ভালমানুষ। বদলে এ সব ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। প্রশাসনে আনরাও রয়েছে।'।

ছোট্টবাবুর সম্মানে লাগে। রাজনীতি বেশের বারটা বাজিয়ে ছাড়ল। ডাক্তার বাড়ির ডাকাত ধরাটা তার কাছে চ্যালেঞ্জ। সহজে কথা বলতে চায় না, তাই সামান্য কড়কানি প্রয়োগ করতেই হয়। নইলে শাসন থাকে না। কাপটা সামলে বলে, 'আপনারাও যদি এরকম কথা বলেন, হেলপ্ না করেন।'।

'হেলপই তো করতে চাই। যাক্‌গে কী করতে চাইছেন?'

'একে থানায় নিয়ে যাব। চাপ দিলেই সব বেরিয়ে আসবে।'।

ডলি চ'চায়, 'না যাবে না। থানাতে মারবে তুমরা। আমি জানি।'।

'আঃ চুপ কর।' অবিনাশ হাত তুলে আশ্বস্ত করে, 'শোন তোমরা, একজনের জন্যে চকা গোপালপুরের বদনাম হচ্ছে। নির্দোষ মানুষকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। জগার স্থান পেলেই তোমরা আমার কাছে জানাবে, কিংবা থানায় চলে যাবে। গারে এলে সবাই মিলে বেঁধে রাখবে। ছোট্টবাবু, আমি বখন এসেই পড়েছি ওকে ছেড়ে দিন। জগা ওর কাছে আসত ঠিক কথা—আমিও জানি। বৃন্দ্রের সম্পর্কে হলেও আমি বলতে পারি ওরা এক হয়নি।'।

ভোলা বলল, 'অটলকা বাজি রেখেছিল জগাকে ভাল করবে।'।

'দেখেনন তো! কী অটল ঠিক বলছে?'

'আজ্ঞে—উকে বলতাম—ডাকাতি হাড়।'।

'চোরা না শোনে ধর্মের কাঁহনী। আর বলতে যেও না।'।

অটল কথা বলে না। একমন কথা। মানুষকে সে ভাল হতে বলবে না। না, প্রস্তুতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয় না। ঘটনাটা এখনও স্বর্ণাপণ্ডে তুন্দ্র শব্দ বাজাচ্ছে, বৃদ্ধে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে, বর্মিভাব এখনও বার্মান। সে অসহায় চোখে শব্দ তাকায়।

'চলুন ছোট্টবাবু পঞ্চায়ত অফিস ঘুরে চা খেয়ে যাবেন।'।

'না। আমাকে থানায় ফিরতে হবে।'।

'আরে চলুন। জগাকে আপনার হাতে তুলে দেবার দায়িত্ব,নিজি।'।

'শব্দ কী জগা? আরও আসামী রয়েছে।'।

‘আপনি নামগুলো দেখেন।’ অবিনাশ এবার বাবলাকে দেখল, ‘হ্যাঁ বাবলা ডি আর ডি এর নেজট অ্যালাইমেন্টে চকার যেন কার কার নাম আছে।’ অটলের দিকে আঙুল বাড়ায়, ‘এর নাম আছে ত।’

বাবলা বলল, ‘আছে। টাকা পেতে ত ঢেক ঘেরী।’

‘বলিছিস্ একে? বলে দিবি বুঝিয়ে।’ অবিনাশ অটলকে বলে, ‘শোন ডি আর ডি এর টাকা পাবে। গাই কিনবে ছাগল কিনবে। ব্যাঙ্ক কল শোধ করলে অনুদান তোমার। আর ওই জগার খামেলার থেকে না। চলুন ছোটবাব।’

অটল চুপ করে থাকে। ষাট কাতও করে না।

উঠান ফাঁকা হয়ে যায়। রোদ পড়েছে। আকাশে মেঘের টুকরোও নেই, কিন্তু পশ্চিমের দিকটা কালো। কাল বৃষ্টি ছিল না। অন্য সময় হলে ঘটনার পর চকার মানবজন উঠান ভর্তি করে প্রতিক্রিয়াজনিত বস্ত্রব্যো মশগুল হত। চাষের ঠাড়ায় গরুর পায় না ঘটনাটা। ভোলা দাঁড়িয়ে আছে। আর ডাল। সে যেন এখনও রাগের তাতান পাতে। চোখে ছালা, স্বরে তীক্ষ্ণতা, ‘হু মরদ আমার। সং সঙ্গে স্বর্গবাস অসং সঙ্গে সর্বনাশ, জেনেশুনে স্যাঙাত করলে, কেমন তার ফল, শেষ করে দিত পদূলিশ, হাজতে ভরে হাড়মাস এক করত, কোন বাপ বাঁচাত তোমাকে? ভাল হয়েছে, এবার যদি শিকে হয়।’ একটু থামে, ‘ডাকাত ভাল করবে, তোমার কী, নিকেশ হলই ত শাস্তি।’ ডলির অকিগোলক বিস্ফারিত, সব উগার হবার পক্ষে এক মূখ যেন যথেষ্ট নয়, আরও কয়েকটা মূখ থাকলে স্বাস্থি পাওয়া যেত। বলে, ‘ও বাবা ভোলা, দেখ ওর হাড়গোড় ভাঙল কী না।’ তারপর নিজেই জিজ্ঞাসা করে, ‘বাজছে নাকি?’

অটল দাওয়ায় বসে বলে, ‘না।’

ভোলা বলল, ‘ভাগিাস্ তুমি রুখে দাঁড়ালে।’

‘না দাঁড়ালে, হোর এই কাকা কী মানব বটে।’

অটল বলল, ‘হ্যাঁ বাবা ভোলা বেলা হচ্ছে গাই দেখি গা, গরু খুঁটা আছে।’

‘একটু বস। তাবাবে যাবে।’ দাবড়ানি ঘের ডাল।

‘হ্যাঁ। বস। গরু দেখতে আমি যোঁছ।’ ভোলা আর দাঁড়ায় না।

ঘরে বালতিতে জল ছিল। ডলির কথাতে অটল মূখ-হাত ধোয়। তার মধ্যে সারাদরে ছয়দান হয়ে বাওয়া সামগ্রী গুলিটরে রাখে ডাল।

ঘরের জিনিস গুলিটরে কাঁটপাট ঘিরে ডাল বলে, ‘হ্যাঁ গো বাজছে নাকি বুকে?’

ডলির স্বরে মমতা। উত্তেজনার মূহুর্ভটি পার হয়ে আদ্র হয়ে উঠেছে তার

বৃক। বৃ চোখে ছালমর বদলে কন্ঠের অন্তর্ভূতি, যে কন্ঠ প্রিয় মানবের জন্য হয়।
ডলি ভাবে না, অটল তার কে। সেদিন রাতের অগ্রাহ্য তার শরীরের অপমান, মনে
থাকে না। মানব শব্দ ভালবাসার প্রত্যাশা করে না, ভালবাসা বানেও সমান
আগ্রহী হয়।

‘না। বাজে নাই।’ অটল জড়িতস্বরে মাথা নাড়া দেয়। বিহীনতার কুরাশা
যেন কাটছে না, মাথা ভার, ঘরের উঠোন অস্বচ্ছ। ঘটনার তার ক্রোধ নেই পদলিখ
ভূমিকায়। জগার উপর মমতা তাকে সঙ্গ দান, গল্প করা, ভালমানুষ করার
ইঙ্গিতের অন্ত্যাপ নেই—ঘটনার বিমূঢ়তা শব্দ। তার মধ্যে ডলি অসামান্য আলোক-
সম্পন্ন হয়ে অটল দীপ্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছে, নতজানু হয়ে বন্দনার জন্য আকুলিত
হচ্ছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়। নিরুচ্চার ওষ্ঠে তারই কম্পন জাগে!

‘এখনও ডর লাগছে। এ মা।’ ডলি এবার হাসে।

অটলের কান্না পায়। জননীর ছায়া যেন ডলি, অটলের আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করে।

‘চা খাবে? করে বৃ?’

‘না। আমাকে বেরতে হবে—বেলা হচ্ছে।’

‘যাবে এখন! চারিদিকে চাউর হয়ে গেছে পদলিখ মারখোর করেছে তুমাকে।’

‘ভাগিাস্ ভূমি এলে।’ কৃতজ্ঞতার অটলের মাথা নত হয়। বৃক ভাঙা জল
মাসে চোখে। বলে, ‘ছেলেট কোথা?’

‘মন্দার্পিসির কাছে। খুব ন্যাওটা উর। তা চা খাবে না।’

‘গাই দইতে গেলেই চা পাব। তোমাকে আর কন্ঠ করতে হবে না।’

‘বা চোখমুখের অবস্থা তোমার, এক গ্লাস গরম দৃখ খেলে ভাল হত। কোথা
পাব।’ ডলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, ‘তোমার জন্যে কেনে যে আমার এত কন্ঠ
হয়। অমন কান্ড দেখে মাথার ঠিক থাকল না। সবাই চুপ করে। তখন কী
করি, নিজের মানের কথা, লাজের কথা, লোক হাসির কথা মাথাতে এল নাই। মনে
হল খালভরা যেন আমারই বৃকে পা দিলেছে। গায়ের মানব ইবার ঘোট পাকাবে।
নানা কথা বলবে।’ ডলি বলেই কাঠিন্য এনে ফেলে, ‘বলবৃক। আমি কাউকে
গেরাণী করি না।’

‘কী বলবে। সবাই বলবে ভাল করেছে।’

‘সামনে। পিছাতে—? তুমি আমার কে বট?’

অটল কথা বলে না, চোখ তোলে না। ডলি কী চায় সে জানে, সে কী চায়
ডলি জানে, অঞ্চ কেন যে ব্যাপারটা বৃষ্টিধোয়ার ঢাকা থাকে, সেখ বৃহৎ কোথ

ওঠে না। এখন বলার ব্যাকুলতা তার নিচু স্বাভাবিক কার্যকরে ভুলে যায়।

ডাল হাসছে, 'কিছু বলবে ?'

অটলের ঠোঁট নড়ে না।

'আমি জানি তুমি কী বলবে। চল, কাজ পড়ে আছে ডেক। তুমিও গাই বড়ইতে যাও।' বলতে বলতে সোজা হেঁটে যায় ডাল, পিছন ফিরেও ঘেঁষে না।

অটল ডাকার চেষ্টা করে, স্বর বের হয় না

ডালের দৃষ্ট প্রতিবাদী ভূমিকাটিতে চকার মানুষ কম ভাব্যব হয়নি। পদালিশ এমনিতেই ভয় উদ্বেককারী, শব্দের মধ্যে গভীর বলবান একটা অস্তিত্ব যা চাক্ষুষ করা যায়, যত না কর্মধারায় তও গল্পে—স্বাধীনতাপূর্ব ইংরেজ শাসনের প্রতীকিত্ব যেন বহমান। গণভঙ্গ, সবাই রাজা, দেশ আন্দোলন, স্বাধীনতা, ভোট ব্যবস্থা, ভোট মূল্য প্রভৃতি কিন্তু অস্তিত্ব বলের সক্রিয়তা অনুভবে নেই। পঞ্চায়েতের ভূমিকা, মিছিল, মিটিং, বক্তৃতা, কংগ্রেস, সি পি এম, বি জে পি, নির্দলে দোলায়িত, কিন্তু শিকার অগ্রসার সচেতনতা নামক ব্যাপারটাকে প্রতীতি দিতে পারনি। ভাঙা বিকৃত স্বার্থান্ধ অবদক, অচেতনের হুঁশহীন জাগরণ। তো পদালিশ, খাঁকি পোশাক, বন্দুক, ট্রুপি, শামুকের মত গদ্যটিয়ে দেয় সবাইকে। সেই পদালিশের মন্থোন্মুখ দাঁড়ায় যে মেয়েমানুষ, সে যে সাম্প্রতিক ভাবে কোন সন্দেহ নেই। এই বিস্ময়ই অটলের সঙ্গে সম্পর্কের বৈধতাকে যেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে দেখার জন্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মেয়েরা গালে হাত চোখ বড় বড় করে পরস্পরকে বলছে, 'মাগার ডর নাই, তুকে যদি বেঁধে নিন যেত' 'ভাগ্যাস পেধান এল,' 'মজেছে—ভিতরে ভিতরে কী কান্ড ঘটছে, মাগো,' হাসাহাসি প্রেম রহস্যের শরীরী ভূমিকার হাঁসত এবং শব্দের মোচড়ে প্রবৃত্তি সূচক। পদব্রূষের কথা, 'ভাগ্যাস মাগা রুখে দাঁড়াল, তা নাহালে ভালমানুষ হাজতে পচত,' 'বিটা ছেলের উপরে যায়।' এ বলার পরও ওই নারীর লজ্জাজনক কামপ্রবৃত্তি অটলে স্মরণীয় ছায়া ছায়া ধোঁয়াও—উজ্জারিত হয়।

চকার নিয়মে বিয়ে সাঙা না করে নারী পদব্রূষের গোপন সম্পর্ক সমাজ-বিরোধিতা। আগে ধরা পড়লে বিচার জরিমানা হত। এখন কানাই বাপদী যদিও মাননীয়, তার দাপটই ছিল বেশি, অসদৃশ্য, চোখে কম দেখে। পঞ্চায়েত গুণে ব্যবহার এ দার নেওয়ার কথা। সামাজিক শাসন, চুরিচামারি, গৃহবিবাদে মধ্যস্থতা। কিন্তু ব্যবসা বড়ই মদ্যচোরা ভোটে যেন ধরে দাঁড় করান হয়েছে। রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও নেই। প্রধান আকর্ষণকে এ পদব্রূষ নিয়ে বড়ই কন্ট ভোগ

করতে হয় ।

ভীলির বিচার হোক । সাঙা করুক ভীল অটলকে, সমাজকে জানাক, পাত পড়ুক অর্থাৎ ভোজ হোক, মনের হাঁড়ি আসুক—এ রকম চকার মনে থাকলেও মৃদে বলার সাহস নেই কারও । যেমন সাহস নেই যেঁতো জগার কুকীর্তির বিচার করা । এখানে ভয় নয়, ভীলির পদলিঙ্গের মৃদোমৃদু হওয়ার মৃদুসাহস বাধা, অটলের সন্ধান বাধা, চাবের জোঁতে চরম ব্যস্ততার শরীরপাতে ক্রান্তি অবসরহীনতা বাধা । ফলে বিষয়টি আর প্রকাশ্যে আসে না ।

ভুলো গরু চরানর সময় একদিন বলল, ‘ভীলিকাকী তোমাকে খুব ভালবাসে ।’

‘কে বললে ?’

‘বলবে আবার কে ? আমি কী ছোট্টেলে বটি—বুঝি না ।’

‘ওঃ কত যে বুঝিস্ ।’ সুখ আভাসিত হয় অটলের মৃদু ।

‘ভূমি সাঙা কর ।’

‘কী যে বলিস্ । রুজ্জগার কুখা ?’

‘হাত পুড়িয়ে খেছ । ঠিক চলে যাবে দেখবে ।’

চলে তো যাবে, অটল ভাবে, সাঙা করতে গেলেই তো জগা খুনের শর্ত । তবে হ্যাঁ, সেদিনের পদলিঙ্গ ঘটনার পর ভীল বুঝিয়ে দিয়েছে শর্তকে সে নস্যাৎ করে দিতে পারে । তারদিক থেকে সাড়া একটু বেশি করে দিলেই গড়ে উঠতে পারে নতুন সংসার নতুন জীবন ।

অটল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুইও তাকাকে খুব ভালবাসিস রে ভোলা ।’

গোপালপুরের নিচুপাড়ার বটতলায় ধীরের মা বসে । স্বামী হারিয়েছে অনেক আগে । মেয়ের বিয়ে হয়েছিল নলহাটিতে । সে মারা যাওয়ার পর জামাই আবার বিয়ে করেছে । ছোট্টেলে দুর্গাপুরে কষ্টাঙারের কাছে কাজ করতে গিয়েছিল । আর ফেরেনি । শোনা যায় ওখানেই সংসার পেতেছে । ডাকাতি মামলার আসামী ধীরে ফেরার হবার পর বড়ীর ভিক্ষে সম্বল । কিন্তু কে রোজ দেয় । রোগা কালো এক মূঠি পাকা ছেলের হাড় সর্বস্ব মেয়েমানুষের এখন হা-অম্ব দিন । মরলা খুঁজিতে প্রায় কক্ষাল, জুড়ে ভুগে হাটার ক্ষমতা নেই, দিনরাত বিষময়, কুখার বিড় বিড় করে । পদকুর এসেছিল, তারপর বটতলায় বসেছে । হেঁটে ঘর পর্বত ফেরার ক্ষমতা নেই । রাত্তার যারাই পার হচ্ছে তাদেরই আকৃতি হিনাতি জানাচ্ছে ঘর বরাবর করে ঘেবার জন্যে । ডাকাতির মারের কেউ হাত ধরতে চায় না । তবুতকে

রোধ, বর্ষা পরিমন্ডলে চতুর্বিধে জল-কাবা, বটতলার চাপড়া ঘাস, পোকামাকড়, আলপাশে ব্যাঙ, গন্ডাফড়িং লাফ মেরে ফিরছে, বৃদ্ধারে কোপ, অকিঞ্চু আতার গাছে অতি শীর্ণ পঞ্চটা কাবাটে ।

‘অ বাপ আমাকে ঘরবাগে করে দে । চলতে পারছি না । অ বাপ ।’

শূনে অটল বাস্ততার সঙ্গে হাত ধরে, ‘আহা হা তুমি জলকাবাতো বসে পড়েছ ।’

বৃদ্ধী হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়, কাঁপছে, বলে, ‘কী করব । যেতে পারছি নাই ।’

‘এলে কেনে ?’

‘একবার পুখোর বাগে যেতে হবে নাই । কে বট ?’

‘অটল । চকার ।’

বৃদ্ধী চিন্তে পারে কী না কে জানে । বলে, ‘অ । ধরে পার করে দে বাপ ।’

বৃদ্ধী হেঁটেই বলে, ‘কাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নাই । অ বাপ খেতে দাঁব ।’

আহা কাল থেকে খায় নাই, অটলের ভারী কষ্ট হয় । বলে, ‘ঘর চল । দেখি কিছু গমি বাওয়া করতে পারি ।’

‘বাঁচা বাপ । কেউ দেখে না, কেউ কথা শূনে না, পোড়া পেটের লেগে মরি ।’

বৃদ্ধী একজনকে পেয়ে সব আবেগ স্বরাতে কেঁদে ফেলে ।

‘কেঁদ না । বলছি ত—আমি দেখব ।’

ঘরে পৌঁছে দোকান থেকে মর্দি এনে বের অটল । খাবার জল এনে দেয় মাটির কলসীতে । আশ্বস্ত করে, সে এবার দেখবে, খাবার এনে দেবে । পড়শীরা চোখ বড় বড় করে দেখে গাংঠিপালের বাগালকে । কোন কথা বলে না ।

একদিনই নয়, তারপর গোপালপুরে গাই বৃদ্ধীতে এসে গেরস্তঘরে সে যে চা রুটি পায় বৃদ্ধীকে দিয়ে আসে । ঘরের রান্না করা ভাত পৌঁছায় । এ খবর অবশ্য ছড়াতে দেরী হয় না । গরু চরাতে গিয়ে ভোলারা নিষেধ করে ।

ভাল বিকেলবেলায় কিরকিরে বৃষ্টিতে মাথার মাথালি নিয়ে এসে বলে, ‘লাজলস্জ কিছু নাই—তুমি ধীরের মাকে খেতে বিতে যেছ ।’

‘যেছি কী আর সাথে । রাস্তায় পড়েছিলাম । কেউ তুলে না ।’

‘কেউ তুলে না ত তুমি তুলতে গেলে কেনে । বলবে না লোকে এদিকে জগার সঙ্গে ভাব, ওদিকে ধীরের মাকে দেখা—তুমি ডাকাতবলে আহ ।’

‘লোকের বলা দেখলে হবে ।’

‘বায় সোদিন লোকে যদি বলত তুমি ভাল লোক লও, ছাড়ত পুঁলিশে—এখন ত হাথতে পচতে ।’

অটল এ বৃষ্টির কাছে হার মেনে নীরব হয়ে থাকে। কিন্তু ভালি ছাড়ে না। সে কোন্ডের সঙ্গে তার বন্ধুতার কথা বলে, যা নতুন সংসার নির্মাণপর্বের স্বপ্ন আভাসিত, যা অটলের প্রতি ভালবাসারই প্রকাশ, যা একজন নারী কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠের জন্যই অনর্ভব করতে পারে। অটল বিরত হয়। সে কিছুতেই ধীরের মাকে দ্বুটো খেতে বেওয়ার মধ্যে কোন অর্থম' খুঁজে পায় না। ভালি চোঁচিয়ে চলে যাওয়ার পর অসহ্যের মত বসে থাকে। তবে ধীরের মায়ের ভার বহন বর্শাধিন করতে হয় না। একদিন মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে বৃড়ী। গারের লোক চাঁবা তুলে সংকার করে।

শাখা এল চকায়। পুর্লিশ হামলার কথা সে শুনছে। ভালমানুষকে কী না দুর্ভোগ পোহাতে হল। ডাকাতের পর জগা কোথায় কে জানে। অটল কি জানে খবর? শাখার জানার আগ্রহ আছে, পুর্লিশের হাতে তুলে নির্নিচ্ছ হবে। জেলবাস করে শান্তি পেয়ে শিক্ষা তো হতেও পারে। মানু'ষটা যে ভাল হবে, হতে পারে সারা অঞ্জলে চেনা-জানার মধ্যে একমাত্র অটল নামের মানু'ষটি জানিয়েছে কেবল। তার সঙ্গে এখানেই মিল। তার দুর্ভোগের কথা শুন্যে শাখার অনেক আগেই তো ছুটে আসা উচিত ছিল! উ'হ, শোনে নি—শাখা শুন্যেছে গতকাল।

ভালবাসার মধ্যে সর্বনাশ থাকে। পিরীতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না। শাখা কবেই টের পেয়েছে। তারপর কেবলই দহন। তবে আশা আছে এখনও। সে কষ্ট করে থাকে। শাড়ি গয়নার মোহ তার নেই, সুখাদোরও লোভ নেই—ভালবাসার মানু'ষ কেন যে বদল না। বারবার কেবল শাখার পরাজয়। প্রসাদকার মেয়ে বৃড়ী তার ফুল, সেই খেলাঘরের কাল থেকে আজও তার ঘনিষ্ঠতা। তিন ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। বাপের বাড়ি এলেই তার কাছে বর্শা সমর পড়ে থাকে। বলে, 'দেখালি বাবা, বিয়ে করবি কবে টে, ছেলোঁপলে মানু'ষ করতে হবে নাই, পিরীতে মজার আগে ভাবতে হত।' বলে, 'ডাকাতের বৌ না হয় হিলি—কী বটে। চোর-ডাকাতের বৌ থাকে না, আর তা যদি না করিস্ বোটোছেলের অভাব। আমার পিসতুতো দেওর রইছে, বলিস্ ত কথা বলি।' শাখা বোঝাতে পারে না। ছেলেবেলার বন্ধু, কত মনের কথা হয়, তাকেও সে বোঝাতে পারে না রহস্য। কেন জগার জন্যে বৃকের মধ্যে একটা ঘর আছে, পাঁজরা ভেঙে সে ঘর বের করা মৃত্যুরই নামান্তর। এখন রাতে তার বারবার স্বপ্ন ভেঙে যায়। এই বৃষ্টি বাইরে থেকে ডাকে। অশ্বকার রাতে বৃষ্টি, ব্যাঙের ডাক, বর্ষা পোকাঘের কলতান বৃকের

উপর চেপে বসে কেবল তাকে কাঁপায় ।

অটল ঘরে নেই । গন্ধু নিয়ে পালে গিয়েছে । শাখা ঘরের খোঁজ করতে কুতোর বেটা পরান ঘর খোঁচিয়ে দেয় । পরেশের মা বন্ধ ঘরের সামনে অপরিচিত মেয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে খুঁজছ ?'

'অটলদা । ওই যে গাংঠিপালের বাগাল ।'

'তা ব্দপূরে কী ঘরে থাকে । গাংঠিপালে আছে । কে বট ? ঘর কুখা ?'

'শিবপূর ।'

'শিবপূর । পরেশের মা কেন চেনার চেষ্টা চালায় ।

কুতোর বৌ মিতি এসে পড়ে । শাখাকে দেখে বলে, 'ওমা তুমি ! তুমি আমাকে চেন না । আমি তো চিনি । তুমি শু শাখা বট ।'

'হ্যাঁ ।'

'আমি মিতি । ব্দুকেই কাকে খুঁজছ ! গাংঠিপালের অটল । ঘোষালঘের আমবাগানের কাছে পাল রইছে । চল এই তো কাছেই । আমিও ভাত নিয়ে ওখিকেই যাব । পরানের বাবা মাঠে আছে । তাহালে দাঁড়াও একছুৎ ।'

শাখা ভাবে, তাকে চিনল কী করে : জগা ছাড়া কে বলবে । ওমনি ভয় আসে মনে । জগার ছায়া যেখানে সেখানেই তো শঙ্কা । সম্পর্কের জন্যে তাকে ঘিরেও অবিশ্বাস বৃষ্টির মেঘ জমে যায় । তবে এর কথার ব্যবহারে তেমনটি তো নেই । অটলদার মত এও কী ঘরদাঁ, জগার ভাল চায়, ভাল করতে চায়, মারা আছে, ভালবাসা আছে ।...

মিতি একটা সাধা কাপড় দিয়ে হাতের পাতায় ভাতের থালা বানিয়ে হেঁটে আসে । বলে, 'চল । শিবপূরের ঘিকে কম বাই, তাই তোমাকে দেখি নাই । খুনোছি তোমার কথা ।' চাপা গলায় বলে, 'কিছু খপর আছে ?'

'খবর । কার ?'

চোখ ঘুরিয়ে মুখে হাসি নিয়ে স্বর অতলে মিতি বলে, 'আমার কাছে গুপন করতে হবে না । আমি তোমাদেরই লোক বটি, অশ্রম করতে পারব নাই । নিজের দেওর নাই—উ ত নিজের দেওরের পারাই বটে । কত বৌদি বৌদি । ডাকাত হলেও মন ভাল । পরানের বাপ কত দূরে আমাকে, সন্দ করে, দেওর ভাতারি বলে গাল দেয়, কিন্তু আমি জানি আমরা পাপে নাই । পটুজুনাও কথা বলে—বলুক—আমি গেরাশ্য করি না ।' খেমে বলে, 'এসেছিল ?'

শাখা মাথা নাড়ায় ঘের ।

‘পদলিশ খুঁজছে। গায়ের মান্দুও তকে তকে আছে। এলেই বেঁধে রাখবে।’

‘রাখুক। পদলিশে ধরুক।’

‘এ তোমার রাগের কথা। অমন করে বলতে নাই। বিচারি কুখা ঘুরে মরছে—কে জানে।’

‘যেমন কাজ করবে, তেমনি ত ফলভোগ করতে হবে।’ শাখা বলে, ‘আর কত দূর যেতে হবে।’

‘ওই তো গরু চরছে। ঘোষালদের আমবাগান ওই ট। কিছুর বলবে উকে?’ মিতির জিজ্ঞাসা করেই মনে পড়ে যায়, ‘আহা ভালমানুষের কী হেনস্থা। হারামজাধা গুণ্ডেকোর বেটা ছোটবাবু বৃকে চিপে পুকার মত মেরে দিছিল গো। ভাগিস্ ডালি তখন রুখলেক।’

‘ডালি কে?’

‘ওমা! জান না। এ গায়েরই। হারার বো। হারা ত মরে গেইছে। এখন ডালি অটলে মজেছে।’

শাখা অবাক চোখে তাকায়। ‘কোন সাড়া করে না।’

‘তবে সাঙা করা বটে। করবেক হয়ত।’

‘একা মান্দু ভালই ত হবে।’

মিতি বলল, ‘ওই দিকে যাও। আমি বাঁয়ের আল ধরব। আবার এসো।’

সামনে একটা পুকুর। শূন্য পাড়। পাড়ের নিচে ক্ষেতের সারি। একজন লাঙল টানছে। ওদিকে আমার বাগান বলতে চারটে আমার গাছ নিয়ে একটা পরোটা সাইজের ডাঙা। গরুর পাল সেখানে। শাখাকে যেতে হয় না। তার আগেই অটল কাছে আসে। হাতে লাঠি, খাটো লুঙ্গির উপর উদাম বৃক, মদ্য ঘাম ভেজা, খোঁচা দাড়িগোফ। শাখাকে দেখে যেন আহ্বাদে একটা ঢেউ বয়ে যায়।

‘এদিকে কোথা?’

‘তোমার কাছেই।’ শাখা হাসে।

‘একদম সময় পাই নাই। শিবপুরবাগে যাওয়াও হয় নাই। ভাল আছ?’

‘হ্যাঁ। কাল শুনলম্ পদলিশ তোমাকে ধরতে এসেছিল।’

অটল যেন সে কষ্টের কথা ভুলে গিয়েছে। বলে, ‘আর বলো না সে এক কাণ্ড বটে। আমি ত ডরেই মরে যেছিলাম।’ হাসি আসে অটলের।

‘তোমার হাসি আসছে! শোনাতক আমি রাগে মরছি। আসুক একবার।’

অটল মাথা হোলার, ‘রাগ চড়াল। রাখতে নাই মাথাতে। শিবপুর গেলেই

তোমার রাগ হয় না। কষ্ট করে এলে কেনে, খবর দিলেই যেতাম।’

‘তোমার রাগ হয় নাই?’

‘জন্মের উপর। তবে হ্যাঁ, ডাকাতি ছাড়ল নাই, রাগ হবার কথা।’

‘আচ্ছা জেল খুঁড়ে এলে ভাল মানুষ ত হতে পারে।’

অটল কী উত্তর দেবে! শান্তি ভোগ করে কী মানুষ শৃঙ্খল হয়, কুর্কম করে না? বলে, ‘হতে পারে। আগুনে পুড়ার জলানি জানে বলে ত মানুষ আগুনে হাত ধের না।’

সহসা শাখার মুখ উজ্জ্বল হয়। খোলা চুল এসে পড়েছে মূখে, মস্ত টিপ কপালে, মূখে স্বামীর বিশ্ময়। বদ্বীপে ভাবনার ঘনত্ব যেন স্রোতধারা হয়ে পড়েছে। কলকল বহমানতার মত বলে, ‘তোমার কাছে এলে ধরিয়ে দিবে—আমিও ধরাব।’

‘আসুক। কোথা যে খুঁড়ে মরছে।’

‘আমি যেছি। তুমি তাহলে যেও।’

‘চল তোমাকে ধাঁড়ান দি শানিকট।’ অটল ঘাড় ঘোরায়, ‘ভোলা আমি একটুই আসছি।’

ভোলা দূর থেকেই বলে, ‘ঠিক আছে।’

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শাখা বলল, ‘নিজে মরছে, আমাকে মারছে।’

‘কী করবে বদ্বীপ। যেমদ ভাগ্য করে এসেছে।’

সবুজ রাস্তা। একদিকে ভোবা, বাঁশঝাড়, তালের গাছ, গোপালপুরের নিচু পাড়ার শূন্য তারপরেই। জোড়া খেজুর নিয়ে পোড়া ডাঙা। পার হলোই মাটির সড়ক শিবপুরের। রোদ এখন বুক ভর্তি, আগুন নিয়ে ফুৎকার ছুঁড়েছে। সবুজ সজীবতার চতুর্দিকে ব্যাপ্ত, জলাচ্ছ অকল্প-গতে কাহাণী জমি, তবু রৌদ্র শাসনের পোড়ান জ্বালার খামতি নেই।

শাখা বলল, ‘তোমাকে যেতে হবে না। আমি চলি যাব।’

পাশে অটল ধাঁড়িয়ে থাকল। শাখার কাছে সে যাবে। কিছু বলার নেই, কিন্তু পাশে হাঁড়াতে ত পারবে।



ভলির ছেলেটার দূর দিন জ্বর। ছেলেকে ঘরে রেখে ধানপুতানির কাজ করতে হচ্ছে। মন্দাপিসি ছেলে দেখে। ভাত দিতে হয় বড়ীকে। লোকে এখন কানি বলে মন্দাকে। দিনমানেও সবই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে দেখে বড়ী। বয়স হয়েছে, সঙ্গে অভাবের রক্তশোষক নলের খিঁচুনিতে খাটো টেনায় আঘাতকা কাঠি শরীরের শক্তি নিঃশেষিত, শ্রুত মাংসপেশী, হাড়ের কাঠামোটা মাটি মৃদু নৃশ, মাথায় শণের মত পাকা ফুল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মাকে নিয়ে গিয়েছিল। থাকতে পারেনি। একা ঘরে থাকে অর্ধাহারে অনাহারে। ভিক্ষে করতে বের হয় এ গাঁ সে গাঁ। এখন ভলির ছেলের দায়িত্ব নিয়েছে। দু'বেলা অন্ন দিতে হবে। ভলি যেন বেঁচে গিয়েছে। এই শেষ আঘাত শাওনের কটা দিন ধান পুতানির কাজ। ছেড়ে দেওয়া যায় না। পনের দিন পুতানির কাজ করতে পারলে তিন চারশ টাকা। ছেলেকে সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার দেখিয়েছে, ওষুধও এনেছে, জ্বর যদি না ছাড়ে! সদর হাসপাতালে কী কোন প্রাইভেট ডাক্তার দেখালেও তো টাকা লাগবে। ক্ষেতের কাদাজলে ছপছপানি কাজের মধ্যে ভলির একটাই ভাবনা, এই বর্ষা কেউ দুঃসংবাদ নিয়ে এল। পুতানির কাজ শেষ হলেই সে অন্য ডাক্তার দেখাবে।

মেঘহীন আকাশের তকতকে বিকেল, যেন ঝাঁট দেওয়া নীল উঠান। রোদের পশ্চিমঢলা দীপ্তিতেও তাপের নিষ্কর। ভলি একটু আগে গা ধুয়ে ফিরেছে। এবার রান্নার আয়োজন করতে হবে। ছেলেকে কোলে নিয়ে বসতে হয়েছে। পিসির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। ছেলের জন্যে বিস্কুট মর্দাড়ে রেখে গিয়েছিল—ছেলে খায়নি। হুমজ্বর। 'খেয়েছিলিস বেটা' বলতে চিঁ চিঁ করে 'না' বলল। পিসি খেয়েছে। স্বীকার করে না, উল্টে রাগ, 'থাকুক তুর ছেলে, দেখতে পারব নাই, ভিন্দু ব্যাওছা কর', বলে বোরিয়ে গেল। তবে ভাতের জন্যে এখন ফিরে আসবে। শুধু তো পিসি নয় দুপুরে পাখা খেয়েছে, তারও তো ক্ষুধা আছে। ভলি সিঁস্কাহ বের কাল সে বেরবে না। তবে রোজই এই সিঁস্কাহ, সকাল হলেই বোরিয়ে পড়া।

হেলেকে ছেড়ে ডলি উনুন ধরায়। একা হলে মর্দুি খেত। ভাবে, না, কাল সে কিছুতেই কাজে যাবে না। ছেলে দেখবে। অটল এসে ঘরের সামনে দাঁড়াতে অভিজান তার দেহমনকে আবৃত করে দেয়, কান্না পায়। উনুনে শুকনো খেজুর পালি গজতে গজতে একবার দেখে ঘাড়ও ফেরায় না।

অটল কাঁধা লেপটে থাকা ছেলেটাকে দেখে। বলে, 'ই কী দশা হয়েছে!'

ডলির বুকে অভিজানকনু ঢেউ থাকা দিয়ে চোখে অশ্রু এনে দেয়।

'আমাকে ত বলে পাঠালে পারতে!'

কোনকালে ডলি বলে, 'কী আবার বলব!'

'হাসপাতাল রাখ, কালকে ঘোষাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।'

'টাকা কোথা?'

'দার করতে হবে। দুধের গিশুকে মরতে দেওয়া যায় না। আমার কাছে চল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকা আছে।' একটু থামে অটল। বলে, 'ছেলে ফেলে তোমার ধান পুড়ুনিতে যাওয়া ঠিক হচ্ছে নাই। আগে ছেলে দেখ—তা বাদে কাজ।'

ডলি এবার শব্দ করে কেঁদে ফেলে। দু' হাঁটুর মাঝে মন্থ রেখে ফোঁপায়।

'এই দেখ, কাদে! আহা আমি ত রইছি। ছেলে ভাল হয়ে যাবে।'

ডলি নিজেকে সামলে নেয় অল্পক্ষণেই। বলে, 'চা খাবে। বস—করছি।' ভাতের হাঁড়ি নানিয়ে চায়ের বাটি বসায়। ঘরে ঢুকে লক্ষটা জেরলে আনে।

বাইরে রৌদ্রহীন বিকেল। পশ্চিম আলোকের ছিটেফোঁটায় ম্লানাতা অপরিচ্ছন্নতা ফেলছে শূন্যে।

অটল ছেলেটার পাশে যায়। বিছানায় মেশা গিশুটি চোখ তোলে। শব্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। পাঁজরা বুক গুঠানামা করছে। এ কী বাঁচবে! ভাবনার অটলের মন মমতাময় হয়, সে কপালে হাত রাখে। পুড়ছে কপাল। বলে, 'বিস্কুট খাবি। ছেলে সাড়া দেয় না। নিম্পলক চাউনি শূন্যে বারিবিস্কুট গাড়িয়ে দেয়। অটল জিজ্ঞাসা করে ডলিকে, 'বিস্কুট ঘরে রইছে?'

'হ্যাঁ।' ডলি এগিয়ে দেয় টিনের একটা কোটো।

অটল খলে বিস্কুট ভেঙে দেয় ছেলের মন্থে। ছেলে খাবার চেষ্টা করে। বিকৃত করে মন্থ, খেতে পারে না।

'জল খাবি। দাঁড়া।' অটলই ব্যস্ততার সঙ্গে গ্রাসে জল নিয়ে সবচেয়ে ঢেলে দেয়

মুখে, ডলির উদ্দেশ্যে বলে, 'জ্বরজ্বালাতে মা কাছে থাকলে আধা রোগ সারে। ছেলে কাহিল হয়ে গেইছে। কাল থেকে বন্ধ কর কাজ।'

মন্দাবুড়ী রেগে বোরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। ভাত খেতে হবে না। সকালে ত পাক্তা ছিল। গরম ভাতের স্বাদই আলাদা। পেটের নাড়িছুঁড়ি টান মারছে। কী যে খিদে, মগতে চায় না। ডলি ঘরে থাকলে তার ছুঁটি, দু' বেগার অন্ন বন্ধ, সে যাবে কোথা! অটলের কথায় কোঁচকান মুখে বিরক্তি রেখা গড়ে বুড়ী। কোলা ঠোঁট নাড়া দেয়। ভাঙা দাঁতের জন্যে শব্দেয়া কেমন যেন জড়ান, 'কাজ বন্ধ করলে চলবে কী করে! অল্প জ্বরজ্বালা ছেলেপিলের হয়। আমি ত দেখছি।'।

ডলি বলল, 'তোমাকে আর দেখতে হবে নাই।'

অসহায়! আর্তি বোরিয়ে আসে বুড়ীর গলায়, 'তাহলে আমার কী হবে? আমাকে ত ভাত দিবি নাই বৌ। আমি কী খাব?'

ডলি সাড়া করে না। অটল পাথরের মত বসে থাকে।

বুড়ী কিম্ মেয়ে থাকে অলপক্ষণ। সম্ভ্যার অধার ঢাকা হয়। বলে, 'এখন ত দিবি। আজ ত আগলুর্লোছ তুর বিটাকে।'

পরের দিনই ঘোষালভাক্তারের কাছে ছেলে কোলে ডলির সঙ্গী হয় অটল। হাঁটাপথ, কোন যান নেই। দু'রকম মাইল তিনেক। শিবপদর ঘুরে রিক্সার অবশ্য যাওয়া যেত। হাঁটাপথ কোথাও খানিকটা প্রশস্ত, কোথাও ক্ষেতের আল। মাঝে খাল, ভাঙা, বাঁশবন, সাঁওতালপাড়া। আলপথ কাদা ছপছপে। বৃষ্টি নেই এই যা রেহাই। রোদ চকমকানি নিয়ে পড়েছে। কোলের ছেলেটা মাথা তুলতে পারছে না, মায়ের কাঁধে রেখে নিজীপের মত পড়ে আছে। রোদ বাঁচাতে ছাতা নিয়েছে ডলি।

হাঁটতে হাঁটতে ডলি বলে, 'শাঁখাও তো এসেছিল তোমার কাছে।'

'শাঁখা বড় ভাল মেয়ে। জগা ওর কাছে এলে ধরিন্ দিবে।'

'ও মুখের কথা, পারবে না। ভালবাসার মানুষকে কেউ কষ্ট দিতে পারে না। দোষ থাকলেও না।' একটু থেমে ডলি বলে, 'বলে রাখছি, আবার তুমি ফ্যাসাদে পড়বে। খারাপ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে সবাই খারাপ ভাবে।'

ঘোষালভাক্তারের বয়স হয়েছে। ছেলেরা বড় চাকুরে, মেয়েদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছিলেন রেলের ডাক্তার। অবসর নিয়ে এখন গায়ে বসেছেন। ভিজিট নেন না। ওষুধের দাম দিতে হয়। ডিসপেনসারী চালায় জগদীশ। সকাল সম্মে দু' বেলাই ভিড় লেগে থাকে। আশপাশের গাঁতো ডাক্তারগণ্য। শিবপদ্রে করেন

চাটুজ্ঞ রয়েছে, বস্তু থাকি। চারজনের পর পাঁচ নম্বরে তাদের ডাক পড়ে। ছেলেটাকে দেখে খসখসিয়ে ওষুধ লিখে দেন। বলেন, 'ভরসা দিতে পারছি না। ইচ্ছে হলে বড় ডাক্তার দেখাতে পার। ভগদীশের কাছে ওষুধ ওষুধ পাবে।';

ডালির গলায় আটকানো কালো উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা জাগে, 'ডাক্তারবাবু ভাল হবেন ত আমার বেটা।'

'বলছি তো অবস্থা ভাল নয়। আগে আসতে পার নাই মা। দেখ যদি বড় ডাক্তারের কাছে যেতে পার। আমার ভরসাতে থেকে না। হ্যাঁ তারপর তোর কী হয়েছে?'

ঘোষালডাক্তার অন্য রোগীর দিকে চোখ ফেরান।

ওষুধ কিনতে ত্রিশ টাকা লাগে। ফেরার পথে ডালি বলে, 'হ্যাঁ গ, বাঁচবে ত।'

'কেনে বাঁচবে না।'

'সিউড়ীতে বড় ডাক্তার আছে। চাটুজ্ঞ ঠাকরুণ বলছিলেন বস্তুমানেও বড় বড় ডাক্তার। উথানেই ত দেখছে ঠাকরুণকে।' কেঁদে ফেলে ডালি, 'টাকা কোথা! অনেক টাকা লাগে।'

'তার একট ব্যাওস্থা হবেন।'

'অত টাকা দিবেক কে! হাজার দু' হাজার।'

অটলের সাধ্যাতীত। তার চূপ করেই থাকার কথা। ডালির পুত্র হারানের আশঙ্কা, উষ্ম, ভয়ত্রাসের কাল্মায়ে প্রশমিত করতে বলতেই হয়, 'দেখি ধারণার করে টাকা ব্যবস্থা করতে হবে।'

পাঁচোকার মূখে দাসেদের চতুষ্কোণ পুরুটোর পাশের জমি থেকে বাবলা হাঁকে, 'দাঁড়াও অটলদা।' কাছে এসে বলে, 'কোথা গইছিলে!'

'এই যে ঘোষালডাক্তারের কাছে।'

বাবলা ছেলেটাকে দেখে। ডালিকে বলে, 'কী হয়েছে?'

'ভুগছে খুব। ডাক্তার তো দেখলেক।'

বাবলা তেমন গুরুত্ব দেয় না ডাক্তার দেখানোর। বলে, 'পণ্ডারের আঁকিস দিকে ত যাও নাই। তোমার ডি আর ডি এ সব হয়ে গেইছে। গাই লিবে ত এক জোড়া! কিস্টেকে বলতে বলিছিলম্—বলে নাই?'

অটল বলল, 'না।'

চাকর সময়। কে কাকে খবর দেয়। আজি পণ্ডারেরে চলে যাও—পেখান থাকবে। তের হাজার টাকা পাবে। কেটে রেখে দিবে তুমার নামে পাঁচ ছ' হাজার।

কল শোধ না দিলে ও টাকা পাবে না। গাই কিনেও দ' এক হাজার পেয়ে
যাবে।'

'কল কেনে করব?'

'তাহালে অনুদান পাবে কী করে।'

'আমি কল ল'ব না।'

'যা বাস্কা: সরকার কী দানছত্র খুলেছে। তব্দ পুরোটাই লাভ।' বাবলা সময়ে
দিয়ে স্বল্প নামায়, 'কোন শালা শোধ দিছে। তোমাকেও দিতে হবে না! লোক
দেখানি, গাই দেখিয়ে দিলেই হবে। সে পাইকারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেই হল।
শ' দ'ই টাকা ধরে দিলে হয়ে যাবে।'

অটল বলল, 'সব ব'ঝছি। আমাকে দেনাদার হয়ে ত থাকতে হবে।'

'কে দেনাদার লয় বল দেখি।'

'আমি জানি। ঢেক ল'কে নিয়েছে, শ'ধছে না। তবে আমার দ্বারা উ অধ্যক্ষ
কাজ হবে না। আমি ল'ন ল'ব না।'

বাবলা অবাক মানে, 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ!'

'দানিয়া আছি। তুমি বলে দিও পোধানকে।'

'তুমি নিজে বলবে। ল'কে পায় না আর তোমার পেয়ে ফেলিন দিরা, পরে
আফশ'ষ করে মরবে।' বাবলা একটা শব্দ করে ওদিকের মাঠে নেমে যায়।

দ' পা হে'টে ডালি নিশ্চিন্ত গলার বলল, 'তাহালে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যেছে।
তুমি টাকা পেলে শোধ দেবে বললে হাজার টাকা ধার পেয়ে যাবে।'

'আমি ত ডি আর ডি ল'ব না।'

ডালি যেন ধমকায়, 'লিবে না মানে। ছেলেটর চিকিৎসা করায়ে না!'

'করাব। বকনট বিচে দ'ব।'

'সে আর কত টাকা?'

'ধার করব। শোধ করব তারপর খেটেখুটে দ'জনায়ে।'

ডালি মাথা নাড়ি দেয়, 'কিন্তু অত টাকা ধার খেটে শোধ করব বললে কেউ দেবে
ভেবেছ? কেউ দেবে না।'

'চেষ্টা করতে হবে।'

'চেষ্টা করবে। হাতের ধন লিবে না—বল ছেলেট মরুক, তাই তুমি
চাও।'

'হিঃ হিঃ কী যে বল, তার ঠিক নাই।'

‘ভি আৰু ভি’ৰ টাকা তুমি লিখে না ?’

‘না ।’ বলেই অটল ব্যস্ততার সঙ্গে আশ্বস্ত করতে চায়, আমি আজই টাকার ব্যবস্থা করছি । ছেলেটকে কাল সিউড়ী নিন্ ধাব । তুমি নিশ্চিন্ত থাক ।’

‘তাহালে টাকার লেগে পঞ্জায়েতে যাবে না ?’

‘না ।’

‘ঠক আছে ।’ ভলি দাঁড়ায় না ।

অটল আটকাতে চায় ব্যগ্রতা নিয়ে, ‘আহা শুন, শুন ।’ ভলি দ্রুত দ্রব্ধ গড়ে । বাড় পৰ্ব্বত ফেরায় না ।

অটল ভেৰোঁছল, সারাটা দিন পড়ে রয়েছে, টাকার ব্যবস্থা সে করে ফেলবে । ভোলার কাছে গরুর পাল রেখে বামুন ঠাকরুণের কাছে, বকনাটাকে বিক্রি করব বলে পিনাক রায়ের কাছে, নুটে গেরন্তর কাছে, ঘোষেদের বড়বোয়ের কাছে মিলিয়েজুলিয়ে পাঁচশ টাকার মত জোগাড়ের অবস্থায় আনে । না, টাকা হাতে পায় না । কাল পাবে । তাকে ধার দৈবার আরও লোক রয়েছে গোপালপুরে । সুদবন্ধকীর কারবার করে বন্ধু, তার কাছে যায়নি । তাছাড়া যাদের গরু চরায় ওই সেনেরা শনিবার গেরন্ত কাঁজের জায়গা থেকে সম্ভারান্ধক ছুটিতে এলে এক দু’শো পাবেই । কথাটা ভলিকে বলে আসবে কী । ভোলা এল । দিনে ভাত খায়নি, রাতে না খেলে চলবে কী করে । মা ডেকেছে । ও ঘরে খেয়ে আসতে আসতে সম্মে গড়িয়ে রাত । গ্রামের বৃষ্টি আরম্ভ হল । ছাতা নিয়ে ভোলা ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল ।

ভোররাতে ভলির কামার শব্দ চকার মানুষকে সচকিত করে দেয় । এঘর ও-ঘর থেকে ছুটে যায় সকলে । ছেলে কোলে, মাথায় চুল এলো ভলি আকুল কামায় ভেঙে পড়ছে । বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির অনুজ্জ্বল সকাল । একটি শিশুর মৃত্যু চকার মানুষকে শাওনের এই সকাল যেন কিছ্ সময় কাটা, আফশোষ, শোক যাতনায় উৰ্দ্ধলিত করে সাহুদনার কিছ্ শব্দ ছোঁড়ার মধ্যে অন্য রকম করে রাখে । এসেছিল একটি শিশু, পৃথিবী তাকে বাস করতে দিল না । কোথায় যেন যন্ত্রণা তাই থেকে যায় । এক মায়ের কামার শব্দও এক সময় ক্রীণ থেকে ক্রীণতর হয়ে ওঠে । বা যার তার চেয়ে বা থাকে তার মায়াই মানুষের কাছে ঢের বড় ।

অটল ভলির কাছে যাওয়ার সুযোগই পায় না । পড়শী নারীকুল ঘিরে থাকে । সকলেরই শব্দ, মৃত্যু, তার কোন গৃহে আগমনে সেই গৃহের প্রতি মিত্রতাবোধ জেগে ওঠে মানুষের । ভলির আজকে খাওয়ার ভাবনা নেই, সঙ্গীও যে পেয়ে যাবে । অটল তাবে, ভলি তো জানে সে মিথ্যা কথা বলে না । বিশ্বাস করবে বৈকী কাল সারাদিন

টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় সে কাটিয়েছে, ব্যবস্থাও হয়েছিল, মৃত্যু যদি ছিনিয়ে নেয়।
হ্যাঁ, বিশ্বাস করবে। কিন্তু ভাবনাই সার। ডালির মনের কথা জানা তার হয় না।
পরদিন ডালি ওর দাঁড়ির বাড়ি দুবরাজপুরে চলে যায়। ঘরে তালো ঝোলে। তাকে
বলে পর্যন্ত যায় না।

শ্যামদাস বৈরাগী লম্বা গড়নের কালো চাঁপ্লিশ পেরুন পুরুষ। মেয়েলী চুল ঘাড়
ছাঁপিয়ে, মূখে তিলক চন্দন ফোঁটা, ধূতিকে লুঙ্গির মত পরা, গায়ে ফতুয়া, কাঁধে
ঝোলা পেটমোটা গৈরিক ধলে লম্বা দড়িতে কাঁধের দু'দিকে ঝোলে খল্লান। মূখে
খোঁচা দাড়ি গোফ থাকলেও কেমন যেন নমনীয়তা, শাস্ততার ছাপ, ভাবুক চোখ, থেমে
থেমে শব্দ উচ্চারণ করে। সর্বদাই বৈক্যবের তুলাদীপ সুনীচেন ভঙ্গীমা, মূখে কথায়
কথায় গভীর তত্ত্ব রূপক উপমা ব্যঙ্গনায় আলটপকা বেরিয়ে আসে। নিজের কথাতে
নিজেই বিভোর মানুষটি, আহা আহা এবং রাখে রাখে ধনিতে পলক শিহরিত হয়।

শ্যামদাসের বৈক্যবী তাকে ছেড়ে গিয়েছে মাস ছয়েক আগে। মানুষটা তারপর
কিছুদিন পর থেকে বেপান্তা, হঠাৎই আজ এল। নগরে ঘর। নামেই ঘর। ঘরে
থাকে ক'দিন। দেশ জোড়া নাকি তার ঘর। আকাশ তাঁবু থাকতে অমন ছুটকো
চার দেওয়ালের মায়ার পড়ে থাকবে কেন। শ্যামদাস বলে। ভীষ্মের বৈক্যবের সঙ্গে
সংসারী অটলের ভাবভালবাসা আচমকা। বিকেলে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে তার ঘরে
ঢুকছিল। তা বৃষ্টি থামে না। রাত কাটাতে হয় শ্যামদাসকে। এক রাতেই
যেন কতালের সখ্য গড়ে ওঠে। তত্ত্ব কথার শোনার গভীর আগ্রহও আছে।
অর্থ সব বোধগম্য হয় না, কিন্তু যেটুকু বোঝে তাতে তার ধর্ম হয়, সে অনুভব
করে। অন্যায়ের বিচার করতে, অধ্যমের কালিমা মুছতে, সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে
ভগবান প্রীকৃষ্ণ ধরাধামে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল পাপতপ্ত ধরণীকে
শীতল করতে, দুশ্চের দমন আর শিষ্টের পালন করতে। যুগে যুগান্তার আবর্তন
হয়। রাধার সঙ্গে লীলাও বড় মধুর। শূনে বুক ভরে যায়।

অটল সকাল থেকে গাই দুইয়ে, বিশুর মায়ের কয়লা বয়ে দিয়ে, গরু খুঁলে আধা
দুপুর কাটিয়ে, দায়িত্ব ভোলাদের কিছুক্ষণের জন্যে দিয়ে, দোকান থেকে চাল আলু
নিরে ভাত সবে মাত্র নামিয়েছে। ফেন গলাচ্ছে থালায়। বেলা বেড়েছে। চড়া
রোদের দারুণ পোড়ানি। ক'দিনের বৃষ্টিহীনতায় বর্ষাচিকু উধাও। ভাত খেয়েই
আবার গরু দেখতে যাবে, এমন অবেলায় শ্যামদাস।

শ্যামদাসকে দেখে খুশী হয় অটল, "ছিলে কোথা এতদিন?"

‘আর কোথা ! কোন ঠিকানা বলল, কাটোয়া, নবদ্বীপ, বর্ধমান—এখান সেখান তা বাদ বাকড়া । পারের তলার ঢাকা, গড়গড়িয়ে বায়, ডেরাইভার আমি নই গো, ঠিক কী না । রাধাকৃষ্ণ, কে ডেরাইভার নিজেই বল । তা ভাত নামল । বড় সন্ধান তোমার ভাতের ।’

অটলের ক্রুখা পেয়েছে, কথার কথা বলে, ‘সেবা হবে নাকি ?’

‘নলছ ! কিন্তু তোমার অগ্রে ভাগ পাড়ব ।’ শ্যামাদাসের মৃদুত্বের বিধা । তারপরই গা ঝাড়ানি দিয়ে বলে, ‘রাধেকৃষ্ণ, তা দাও । বড়ই ক্রুখা । পেটের বাঘ অনেককণ থেকে হালুম হালুম করছে । ভাতের গন্ধে গরগরানি এখন আবার । চিঁড়ে মর্দুতে চারদিন পার করোছি । রাধে কৃষ্ণ ! পেটে পুর্বোচ্চ বাঘ, কতদিন ভাবি পাখি পুর্বব, দুটো দানা পেলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু বাঘ যে খাঁচা ছাড়ে না বাবাজী ।’

অটল নিঃশব্দে ভাতের সঙ্গে সেন্স আলু আর কচু তেল নুন দিয়ে মেখে দুটো কাঁচালংকা খালার পাণে দিয়ে ভাত সাজিয়ে দেয় । হাত ধুয়ে কৃষ্ণে নিবেদন করে শ্যামদাস খেতে বসে । তার :চোখেমুখে যেন রাজকীয় খাদ্য সম্ভারের আয়োজন এমন সুখ । গ্রাস তোলা, মৃদু নাড়ার মধ্যে অমৃত আশ্বাদনের ভঙ্গী । খালা মৃদুত্ব লেব । বলে, ভাত আছে ?

‘হ্যাঁ ।’ অটল তো কালকে পাক্ষা রাখবে বলে বেশি চাল নিয়েছে ।

‘ছেলে দাও । রাধে কৃষ্ণ । দাও—সবটাই দাও ।’ হাঁড়ি উজাড় করে তৃপ্তির চকুর তোলে । হাত ধুয়ে বলে, ‘এই দেখ, তোমার ভাত রইল না । খাবে কী ।’

অটল বলে, ‘মর্দু ।’

‘বলছিলাম না বাধ পুর্বোচ্চ পেটে । সে কী মনে রাখতে দেয় কিছ্ । এই দেখ খেয়ে ঘুমোল । এখন মনের পাখি কিচিরমিচির করছে । এর জ্বালাতনও কম নয় । বলছে, অটলের কী হবে । ওর ভাত যে তুমি খেলে ও খাবে কী । লাও ঠালা । রাধে কৃষ্ণ । তা পাক আমিই করি ।’ কঠোর ঝোলা থেকে চাল, আলু, একফালি কুমড়া বের করে । ‘লাও, হাঁড়ি চাপাই । জল রইছে বালতিতে !’ নিজেই কাঠ দেখে নিয়ে উনুনে দেয় ।

অটল বিব্রত বোধ করে, ‘আহা, তোমার জিনিস রাখ ।’

‘ভিকের চাল খেতে লাগ ।’

‘তা কেনে !’

‘না খেলে আমার মনের পাখির কচকচানি বন্ধ হবে না । তুমি চুপ করে বসে থাক । চাপাব আর নামাব । সেবা করছে দাও ।’

‘পালে গরু আছে । আমার দেবী হয়ে বাবে ।’

‘তোমার ভোলা পদাই গোপাল বিষ্টে ওরা তো আছে—দেখবে ।’ শ্যামদাস রামায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে । ফুঁ দিয়ে উনুন ধরায় । চালে জলে আলু ফেলে দেয় । বলে, ‘তোমার খবর বল ।’

অটল সবিভারে জগার কথা, পদূলিশের ধরে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দেয় ।

‘ডাকাত জগা তোমার স্যাঙাত হয়েছে জেনে পদূলিশ এসেছিল ? কিন্তু সাধুর স্যাঙাত চোর হয় কী করে ? বাঘে হরিণে মদ্য ছোঁয়াছুরি করতে পারে না, আলোর কাছে কী আঁধার তিষ্ঠে ? পদ্ব পশ্চিম তো একদিকে হাঁটে না ।’ শ্যামদাস উনুনে কাঠ গোঁজে । আগুন বাড়ায় । বলে, তাহালে আধমরাকে বাঁচিয়েছে তাই ।’

‘ভেবেছিলাম ভাল মানুষ হবে । বাজিও রেখেছিলাম তোমাদের সঙ্গে ।’ ওর ডাকাতি করা ছাড়াব ।’

‘পারলে না তো ।’

‘না ।’

‘জগা তোমাকে ডাকাত করতে চাই নাই ? টাকার লুভ স্বেধের লুভ দেখায় নাই ?’

অটল ঘাড় কাৎ করে, ‘হ্যাঁ । দেখিস্ ছিল ।’

‘টানাটানি চলছে । তুমি উক টানতে পার নাই—উ তুমাকে না ! লাও ভাত হয়ে এল । ভাত রোঁপে খেতে পেলে না—রাগ হয়েছে—কষ্ট লাগছে ?’

‘তা লাগবে কেনে ! আমিই তো দিলম তোমাকে ।’ অটল হাসে প্রশ্ন শুনেন ।

শ্যামদাস বাঁকা ঘাড়ে প্রশ্ন করে, ‘ঠিক বলছ ?’

‘হ্যাঁ । তোমার চাল চাপান ঠিক হল নাই । ধরে চাল ছিল ।’

‘থাকুক । আমাকে ভিখিরি বলে দানের ধম্ম করতে দিবে না । তুমি অতিথ ধম্ম করেছ । আমি বরিগা মানুষ, বদ্বা আর খঞ্জনি সম্বল । বদ্বার ধন দিয়েছি । রাখে কৃষ্ণ । তোমাকে শৃঙ্খলাম রাগ হয়েছে কী না । আহা, তোমার ভিতর ধম্ম-নদী । শীতল জল রাগকে চান করিয়ে হি হি কাঁপুনি ধরিন্ দিয়েছে । আমি কত বদ্বা দেখে—বদ্বি নাই ।’

‘ধম্মনদী আবার কী ?’

‘বলব । খেতে খেতে শুনবে ।’

‘তা না হয় শুনব । উনুন ছাড় । খেয়ে জ্বিয়েন লিবে কোথা—রাঁধছ ।’

‘উহু, ছাড়ব না। আমাকে খাইয়ে দিবি। আনন্দ লুটে গিয়ে। বোকা ভেবো না, আনন্দ আমিও কুড়িয়ে লিভে জানি। রেঁখে বেড়ে তোমাকে খাওয়াব। মন পাখি শুধু বন্ধুর মধ্যে শিশু দিয়ে গান গাইবে বাবাজী।’

অটল খেতে বসে। খালা সাজায় শ্যামদাস। তারপর হাত ধরে বিড়ি ধরিয়ে গর্দায়ে কথা শব্দ করে, ‘কী যেন বলছিল! ধম্মনদী। তাহলে শুন। দেখতে মানুষ সব একই। ভিন্ন ভিন্ন রঙ রূপ বটে, কিন্তু একটা মাথা, দু’টি চোখ, দু’টি কান, একটি নাক, দু’টি হাত, দু’টি পা সবারই। রক্ত মাংস হাড় মেদ মস্তক আর কাঠামো, তাতে পঞ্চভূত, ক্রান্তি অপ তেজ মরুৎ বোম। মামুষ যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপের তেমনি ভেতরেও মনের নানান রূপ। কেনে হয় সে এক রহস্য বটে। মনের মধ্যে নদীর খেলা। বল কল ছল ছল। এদিকে বইছে, ওদিকে বইছে।’

অটল মূখে পোরা ভাতের গ্রাস শেষ করে বলল, ‘তার নামই ধম্মনদী!’ ধর্ম নদী অধর্ম নদী। পাপের নদী, পুণ্যের নদী। কাম ক্রোধ মোহ মদ মাৎস্য, অধর্মের নদীতে আত্মলিপাতালি কণা বেড়ায়। খালি জ্বালা তাতে। সোবাতি নাই, আনন্দ নাই। আর পুণ্যের নদী, ধর্মের নদীতে সখ আর সখ। কলকলানি ছলছলানিতে নুপুংস বাজে। শ্রীরামের নুপুংস।

‘তাহলে আমার মধ্যেও নদী আছে?’

‘হুঁ। সম্ভার মধ্যেই নদী। তোমার অধর্মের নদী খটখটে। ধর্মের নদীতে জল কেবল বয়।’

‘আমি ত ঠাণ্ডা করতে পারি না!’

‘কান পাতলেই পারবে।’

অটলের ভাতের গ্রাস মূখে ওঠে না, ‘নিজের বন্ধুকে কী কান পাতা যায়?’

‘হায় হায়, ও কান কী বাইরের, ও যে ভিতরের গো। রাখে কক্ষ।’ শ্যামদাস বলে, ‘লাও খেয়ে লাও।’

অটল অনেক কথাই বোঝে না। তবে ধর্মের নদীর শব্দ শোনার কামনা জাগে। মনে হয় বৈরাগী কত রহস্য জানে। ডলির মনকেও নিশ্চয় বুঝতে পারবে। তার সঙ্গে দেখা করল না, চলে গেল। ফিরে কী আসবে না? ডলি চলে যাওয়ায় কী ভীষণ শূন্যতা সে যে টের পাচ্ছে, কত কষ্ট যে হচ্ছে তার।

‘তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।’

‘বলে ফেল।’

‘গরুর পাল থেকে আসি, তাবাসে বলব।’

শ্যামদাস বলল, 'খেজুর পালির ভালাইট দাও। গা গাড়িয়ে লুবে। ঘরে কুলদুপ
এঁটে, চাবি নিয়ে যাবে। আমার থাকা না থাকা সমান।'

'সে কী, চলে যাবে?'

'যাব না ত ভাবছি। তবে ডেরাইভারের বা মরজি—শুনবে কী কথা।'

অটল বলল, 'না। তুমি যেও না। বলছি না কথা আছে।'

শ্যামদাস ভালাই বিছিয়ে 'জর রাখে' বলে শূয়ে পড়ে।

হনহনিরে হাঁটে অটল। মাথায় আবার ধর্মনদী আসে। তার মধ্যে আছে, জল
রইছে। নিজের নদীটির শব্দ কেমন! শ্যামদাসের রাধা ভাত বড় সুস্বাদু ঠেকেছে,
তৃপ্তিতে ভরেছে শরীর—কেমন যেন নেশাজ্বরতা আসছে এই অবেলান। তখনই সে
ভেতরের ঢেউ অনুভব করে। হাঁটা থামায় না, হিম্মোলিত সুখ কাশফুলের গন্ধের
মত দোলা খার সমানে, বাতাসে সে যেন ভাসে। তারপরই কী আশ্চর্য চোখের
সামনে সে দেখতে পায় এক নদীকে। সত্যীর আলোচ্ছটার নদীর ঢেউয়ে রূপোলী
মুকুট লক্ষ কোটি হয়ে নেচে চলেছে। নদীর পাড়ে সবুজ শ্যামলিমা, পরিপূর্ণতার
ফসল ক্ষেতের পর ক্ষেতে। দেখা যেন ফুরোয় না। আশ্চর্য নদী আশ্চর্য হরিৎ
সমারোহ এ পৃথিবীরই। আবার যেন এ পৃথিবীর নয়। দর্শন শিহরণ জগা তারই
সুখ হিম্মোলিত সমগ্র হিম্মিরকুল আনন্দময় হয়ে ওঠে। আনন্দ—আনন্দ। অটল
পৃথিবী থেকেই বৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

'আরে এত ডাকছি, শুনতে পেছ না।' বাবলার উদ্যম গা, লুঙ্গি হাঁটু বরাবর
তোলা, পা কাদাটে, ঘোষা রোদপোড়া মুখ, মাথার চুল এলোমেলো। বখারি বোঝা
কুদে মাছির দঙ্গল উড়ছে মূখের সামনে। বলে, 'শুনলম জগা এসেছে। দেখা
গেইছে উকে।'

'তাই নাকি? তুমি দেখেছ?'

'দেখলে আর শুনখাই। শালোকে ধরে হাজতে ভরতাম।' বাবলার মুখ কঁচকে
যায়। মূখের সামনে পাকুমারা মাছেরা বিস্তৃত করছে, হাতের খাপটায় সরাবার ব্যপ্ত
চেষ্টা করে। বলে, 'তোমার ত স্যাঙাত। আসবে তোমার কাছে।'

অটল বোকার মত আবার বলে, 'তাই নাকি! আসবে?'

বাবলা বিরক্ত হয়। ডি আর ডি এ'র লোন নেয়নি, কাগজপত্র সব ঠিকঠাক,
প্রধান নিজে বৃষ্টিয়েও পারল না, রাগ হয়ে গিয়েছে। বাবলাও সেই রাগের খানিকটা
ঝাঁজ নিজের মধ্যে নিয়েছে। সে অবশ্য নিবোধ ভাবে অটলকে। এ বরসেও গল্পব্যাগালি
করে। বলে, 'মাথাতে ত কিছ্ নাই। তোমাকে বাবা বোকা কঠিন। বরস হলে কী

হবে, বাগাল ছোঁড়া হয়ে আছে। মনে রাখবে, ধরিন্ না দিলে তোমাকেও ফাটকে পড়বে। ফুন্ শালা বাঁচাবে না।’

অটল ভয় পায়, ‘এলেই ধরিন্ দব।’

‘হ্যাঁ। মারার করে ছেড়ে দিও না। তোমার শু ভিন্দু চরিত্তির।’

শাবলাকে ছাড়িয়ে গরুর পালের দিকে যেতে যেতে অটল ভাবে, তাহলে জগা এসেছে এদিকে! কতদিন লুক্কিরে থাকবে। তবে ভাবনাটা মাথায় বেশিক্ষণ তিষ্ঠেই না। শ্যামদাসের কাছে ডলির কথা বলবে, তার বশুগার কথা বলবে, ধম্মনদী অনন্ডবের কথা বলবে, শ্যামদাস বললে সে ডলির সঙ্গে দেখা করতে বাবে। তন্ময় হয় সে ভাবনার। তারপর লোকের ঘরে গরু ঢুকিয়ে সম্ভবেলার নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে দাওয়া শূন্য, খেজুর পাতার তালাইটা একধারে গোটাটো।

বিকেলবেলার মেঘ আসে। বড়ই প্রয়োজন ছিল। ক’দিন নাপাড়ে রোদ পিপাসার উবে গিয়েছে ক্ষেতের জল। বিকেলের জোর বর্ষাণের সম্ভের মূখেই কিম্বদী। অশ্বকারে জড়িয়ে আছে ঝিরঝিরানি, বাতাসে শীতলতার শ্বাদ। ঘরে অটল লক্ষ জেন্নেলে বসে। বর্ষার চাল নষ্ট হয়েছে, এক কোণে জল করে, ওদিকটা কাপাটে হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি আবার নিজেকে ঝাঁকিয়ে জোরে নামতে পারে, অটলকে কামেলার পড়তে হবে। ভাত রান্না করতে পারেনি বৃষ্টির দাপটে। দোকান থেকে বড়ি এনে খেয়েছে। কত আর বসে থাকে। লক্ষটা নিবিয়ে সে শূন্যে পড়ে।

রাতের গভীরতার মাপ থাকে না। দরজার শব্দ অটলের ঘুম ভাঙায়। লক্ষ জেন্নেলে ‘কে’ জিজ্ঞাসাতে ব্যস্ত শব্দ তৌকর। ঝুলতেই জগা। ঢুকেই বন্ধ করে দেয়। লক্ষের লালচে আলো মানবটাকে প্রত্যক্ষ করায়। একমুখ দাড়িসৌক, মাথায় ছড়ানো চুলের রাশি, পাজামার উপর বৃক্ খোলা শার্ট, বৃষ্টিভৈজা, ন্যাতানো। লুখে নেই, উষ্ণতা এবং প্রতিনিয়ত ভয়ের তাড়না কপালের রেখার, দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে।

‘একট বিড়ি দাও দেখি।’ ভিক্সে সিটিন্ গেলম। অটলের হাত থেকে বিড়ি নিয়ে লক্ষ জন্ালিরে লক্ষটা নিবিয়ে দেয়, হুশ হুশ করে টেনে বেন তাপ সংগ্রহ করে।

‘এলি কেনে তুই আমার কাছে।’

‘তোমার কাছে ছাড়া আসব কোথা! হুদিলিরা আছে। ধরার লেগে পুঁজিশ ওল্ চলতে আছে। বাক্ গো, ধর কী বল। শাঁবা কেমন আছে?’

‘আমি যদি তোকে ধরিলে মি ।’

‘পারবে না তুমি ।’

‘পারতে হবে । না পারলে অধর্ম হবে ।’

‘তোমাকে অধর্ম করতে হবে না । ধরিয়েই দেবে । আর শালা জনালা ভাল লাগে মা ।’ জগা পরাজিতের গলা করে সহানুভূতি কুড়ুতে চার, ‘তার আগে আমার কথার জবাব দাও—শাঁখা কেমন আছে ? দেখা হয়েছিল ?’

‘ভাল ।’ অটলের গলা ভারী হয়, ‘একটু মেরেকে সারাজেখন কাঁদিয়ে বোঁহিস্ । পাপ হচ্ছে না তোয় । তার ফল ভোগ করতে হবে নাই ! এই যে লুক্কিরে বিড়াহিস্ । শাঁখাও এসে বলে গেল, তোকে পদ্মিশে ধরিয়ে দেবে, তাহালেই শোধরাবি ।’

‘শাঁখা এসেছিল চকায় ?’

‘হ্যাঁ । তোর লেগে পদ্মিশের মার খেলম্ তার খপ্পর করতে ।’

‘শুনোছি । কী করব, তাতে ত আমার হাত নাই । ডলিবো রুখোঁছিল ?’

‘হ্যাঁ । পেখানও এসেছিল ।’

‘ডলিবোকে সাঙা করছ তাহলে ?’

‘নাই । গাঁ ছেড়ে চলে গেইছে । আমাকেও বলে যায় নাই ।’ অটলের বেদনার রুদ্ধপাক বাতাসটা যেন ঘরপাক খায় । কাউকে বলে মন খালাস সে করতে পারেনি, কারও সহানুভূতিও পায়নি, কেউ তার হারানোর শোকের কথা জানতেও চারনি ।

‘চলে গেল । তুমি আটকাতে পারলে না ?’

‘না ।’ অটল অসহায় মাথা নাড়া দেয় ।

‘কোন মরোদ নাই । ধর্মের পায়ে মাথা কুটে গেলোট কী ! লবডম্কা । আমার কথা শুনলে মেয়েমানুষ তোমার গা ন্যাওটা হয়ে থাকত ।’

‘তোর কথা—তোর অবস্থা তো দেখছি ।’

‘কী দেখছ ? বন্ধলে ডাকাতের অনেক বন্ধু । আমার কোন অসুবিধাই নাই যিখানে আছি । আমাকে পদ্যবেই, পরে ফয়দা হবে । শালা ডাকাতের ঘরে যে ফেসে যাব—কে জানত ।’

‘তোর দলের ত সবাই ধরা পড়েছে । ছাড়া কেউ পায় নাই ! পেঙ্গাদের পা গেইছে । ধীরের মা— ।’

‘রাখ তো ওসব কথা ।’

‘ভুই তাহালে ধরা দিবি ।’

‘হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তোমাকে একটু কাজ করতে হবে।’

‘আমি ভোর কোন কাজে নাই।’

ব্যগ্র গলার জগা বলল, ‘আহা খুন, শাঁখাকে বলবে পরশু ভোরবেলাতে যেন শিবপুরের সোড়ে দাঁড়ায়। ভোর চারটের বাস ধরবে। বৃথলে উকে নিয়ে কোলিমারির দিকে চলে যাবে এ দেশ ছেড়ে। খেটেখুটে খাবে। ও যেন দাঁড়ায়। সঙ্গে কিছু নিতে হবে না।’

‘বলিস্ কী! পালাবি! তাহলে যে বললি ধরা দুব।’

‘না। ধরা দিলে জেল। ফিরে সেই ডাকার্জি করতে হবে। ভালমানুষ হতে চাইলেও এখানে পারবে না। কেউ ভালমানুষ হতে দেবে না। পূর্নিশ টাকা চাইবে, টাকার জন্যে ডাকার্জি করতে হবে। ধানিদার মাল কেনার জন্যে টাকা দিয়ে উসকে দেবে। দলের লোক বলবে বসে হাওপায়ে খিল ধরছে।’

অটল ভাবে, সবই সত্য। চেতন এসেছে জগার। ওকে ভালমানুষ হবার, এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া ধর্ম। তবে বলে, ‘আমি কথা দিয়েছিলাম তোকে ধরিয়ে দুব।’

‘তোমার ঘরে আগ্রর নিয়োছি, শাঁখাকে নিয়ে পালিয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইছি, ভালমানুষ হবার শেষ সুযোগ তুমি দেবে না? এতে যে তোমার অধর্ম হবে।’ উত্তরহীন অটলকে, বলে, ‘তাহলে ওই কথা রইল। শাঁখাকে বলবে। কেউ যেন আর টের না পায়। আমি চললাম।’ বলে জগা দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

অটল দরজা বন্ধ করে। ঘুম আসে না। বড় মশার উপদ্রব। বাইরে আকাশের ঝিরঝিরানি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। অটল ভাবে, শাঁখাকে নিয়ে চলে যাবে। নতুন সঙ্গ পাবে, নতুন জীবন গড়বে। আহা ধর্মনদী তো জগার মধ্যেও আছে। তার সব জল শূন্য হয়ে ফেলেছিল। জল টলমলে করে রেখেছিল অধর্মের নদীতে। তাই চূঁরি, ডাকার্জি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই। ভেসে গিয়েছে সব বোধ। সত্যতা, ন্যায়, মানুষের উপর ভালবাসা এ সবের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে গিয়েছে। এবার ধর্ম-নদীর জল বইবে কলকল ছলছল। জগা দেখতে পাবে না, টের পাবে না, তবে বইবে। বৈরাগী বড় জম্বর কথা বলেছে। আহা ধর্মনদী। কী মধুর শব্দ তার বহমানতায়। ওর ধারে গড়ে উঠবে বনানী, শান্ত সরল জনপদ। আকাশের সহস্র চন্দ্র সেবতা তাই দেখে খুশী হবেন। জগাকে দেখে মনে মনে বলবেন, আহা জগার ধর্মনদী জেগেছে, ওর সব পাপ কমা করে দিলাম। অটলের এরকম ভাবনাটা তার বোধের অপরিস্ফুটতা সত্ত্বেও গড়ে, আনন্দ জাগে, নিশ্চিন্তের শান্তিময়তা তার শীতল

সর্বগ্রানিহর পেলব হাতের পালক ছোঁরা নি আদরে একসময় ঘুম পাড়িয়ে দেয় ।

সকালে ঘুম ভাঙে । বাইরে ধবধবে ফরশা, রাতে কখন মেঘ উষাও, স্নানান্ধিতায় পাখির ডাক, মানুষের সাড়া । প্রফুল্ল অটল মৃদু খুঁতে যায় পদকূরে । ভোলা বলে, 'শুনলে ! দে'তো জগা রেতে ধরা পড়েছে । কী মার না মেয়েছে । বেঁধে তাবাদে থানায় নিয়ে যেছে ।'

শোনা যেন বিশ্বাস হয় না । প্রত্যুষ উৎকলিতা, শাস্ত নিশির ঘূমে শ্রান্তি অপনোদন, সকালের নতুন প্রাণশক্তির অনুভব নিমিষে অস্তিত্ব । বেদনা ভেঙে দেয় বৃক, কুঁজো হয়ে যেতে হয় । চোখের সামনে সব দৃশ্য অস্থির হয়ে পড়ে । চোখে এসে পড়ে জল । অটল কেমন করে বোঝায়, জগা পালিয়ে গিয়ে শাঁখাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেষ্টাছিল । যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ শলাকাবিশ্বিতায় রক্তপাতের ধারা নামে ভাবনায় । আকণ্ঠে হয়, সন্ধ্যোগ পেল না । কাকে দোষ দেবে অটল । মাথার উপর ওই যে দূর আকাশের নীলিমায় দিনমানে তো জ্বলন্ত সূর্য, রাতে নক্ষত্রের চোখ, ধর্মের দেবতাকে কিছুই ফাঁকি দেওয়া যায় না । আলোর অশ্বকরে বর্ষণে শীতকরানিতে হিমকুয়াণায় শিশিরপাতে তাঁর চোখ অনায়াস প্রত্যক্ষ করতে পারে সূর্যলিখার মত । কড়ায় ক্রান্তিতে তাঁর হিসেব । পালিয়ে বাঁচবে কেমন করে । তবে দেবতা কি ক্ষমা করতে পারেন না ! কে জানে ! অটলের কতই বা জ্ঞান ।

সারাদিনে অটল কত কথাই যে শোনে । জগার যাবজ্জীবন হতে পারে, ফাঁসিও হতে পারে । ফাঁসির আগে তার শেষ সাধ পূরণ করা হয় নাকি ! জগা যদি বলে, শাঁখাকে নিয়ে তার ভালমানুষের জীবনের স্বাদ আছে, তাহলে ফাঁসি হয় কী করে । ফাঁসি হবে অথচ সাধপূরণের কান্ড থাকবে, এটা যে কী করে হয় । মানুষের সব চেয়ে বড় সাধ তো বেঁচে থাকার, পৃথিবীর বাতাস নেবার, সে সাধের চেয়ে বড় সাধ কী । মালতী সারাদিন কেঁদে কেঁদে ফিরেছে, অভিসম্পাত দিয়েছে হারা ধরিয়ে দিয়েছে তাদের । সন্ধ্যায়ও কান্না থামেনি । বাতাসকে আকুল করে অটলের মধ্যে পাক দিতে থাকে সেই কান্নার কঁপা সুর ।

অগার পাঁচ বছর, দলের অন্যদেরও ধীরে, ফনে, পেঙ্গাদ, তাঁপি, গোলক এমনি করে আটকনের দুই চার বছর করে সশ্রম কারাবাসের সাজা হয়। সংবাদটা চক গোপালপুরের কাছে কিছটা গুরুত্ব পায়, আপোচনা হয়। এ সময় লক্ষ্মী বড় সদয়া, চতুর্দিকে ধান—অম্মর অঙ্কল। ধানকাটার মরসুমে হেমন্তের সুখবৈভবের জন্য উৎসবপূর্তির পর অবসরে আমোদ এবং গালগল্প জমে ভাল। গোপালপুরে পশুরসের আসর বসে, উপলক্ষে মেলা, আটদিন ধরে মাণ্ডারকুমারের ম্যাজিক শো হয়, বিয়ে হয় বাবলার ছোট বোনের, ভুতোর ভাইয়ের। এ সময় ধান বেচে পুরোন দেনা শোধের গা ঝাড়া ভাব মানুষের মনকে প্রফুল্ল রাখে। অপরের কথা একটু দীর্ঘ সময় ধরে ভাবায়। সেইতো অগার দলের সাজা, খমের কল বাতাসে নড়ে, দেশে শান্তি এল ইত্যাদির গল্পও ভাই বেশ ক' দিন চলে। মালতীর হা-হুতাশ ব্যাপারটাকে জাগিয়ে রাখে। এদিকে অটলও হয়ে ওঠে একটা গল্পের চরিত্র।

অনারি চন্দ্রবর্তী কিশোর পুত্র চণ্ডীদাস আর স্ত্রীকে রেখে গত হন। মদ গাঁজা দুটোই সমানে চলত। ফরশা বর্ণটি তার ফলে কালিবর্ণ হয়, স্বাস্থ্য ভাঙে, অকাল-বার্ধক্য নামে শরীরে। অসুস্থ হয়ে বার্থ চিকিৎসায় অর্থপ্রাশ্রণ করে ধান তের। দু'দামিন্দিরের দশ বিঘে নিম্বক জমির স্বত্বভোগ ছাড়া উপার্জন ছিল পুরোহিত বৃত্তি। শিবপুরে বেশ কিছু পরিবার তাঁর বজমান ছিল। গত হতে স্ত্রী শান্তি-ঠাকরুণ কিশোর পুত্রটিকে এই বৃত্তিতে নিয়োগের চেষ্টা করে। কিন্তু চণ্ডীদাসের ঝেরাড়াপনার শূর্য প্রাথমিকের গাড়ী ডিঙানর পরই। বারবার ফেল করে, স্কুলে না গিয়ে মাঠে-বাটে ধুরে বেড়ানয়, জোর করে মায়ের কাছে টাকা পরসা নিয়ে সিউড়ী কী আসানসোলে মামার বাড়ি চলে বাওয়ার কৈশোর দিনগুলি পার করে। বাবার মৃত্যুর কোন প্রতিষ্ঠানই নেই। মাকে শোষণ করেই তার দিনযাপন। শান্তি শিবপুরের কিছু চাটুজেকে মাইনে দিয়ে দু'গার নিত্যসেবা করার, বজমান ধরে কাজও করার, নিজে গিয়ে উপািস্থত হয় অনুষ্ঠানে। পুরোহিত প্রাপ্য দানসামগ্রী নিয়ে আসে। কিছুকে তার ইচ্ছামত একটা অংশ দেয়। এ ব্যাপারে অবশ্য কিছুই কোন কোন থাকে না। অনারি চন্দ্রবর্তীর বজমানের কাছে প্রাপ্তি তার পরিবারই তো

ভোগ করবে। শাস্ত্র পত্রটিকে ধরে রাখার হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্নেহ বিকর
বস্তু। তার কৃত্য কেবল কামাই দেখলে থাকে। চণ্ডীদাস এতে বিরক্ত হয়। তারপর
কয়েক চার ভরির মত সোনা আর নগদ তিনশ'রও কিছু বেশি টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।
তিন বছর আগের ঘটনা। শাস্ত্র খোঁজখবর চালায়, কাঁদাকাটা, এখানে ওখানে
আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া কী চিঠিপত্র দেওয়া, থানা পুলিশ, নানানভাবে খবর পেয়ে
লোক পাঠান ইত্যাদিও কম করেনি, কোন খোঁজ নেই। শাস্ত্র বিশ্বাস করে, তার
চণ্ডীর সন্মতি হবে, একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে গোপালপুরে।

শাস্ত্রীঠাকরুণের সঙ্গে অটলের সম্পর্ক গাইগরুর জন্যে। গাংঠিপালে ওরও চরায়,
বাছুর হলে দোহানও তারই কাজ। সকালবেলার গরু খুলতে আর পৌঁছে দিতে
বেতে হয়। কাইফরমাসও সে খেটে দেয়, তো সে অটল শিবপুরে কোন গেরস্ত কী
ঠাকরুণের না করে। তবে শাস্ত্রীঠাকরুণের বাড়তি আর একটা কাজেও তাকে সঙ্গী
হয়ে সাহায্য করতে হয়। ঠাকরুণ মেয়েলী রোগের টোটকা ওষুধ দেয় পাঁচ সিকের
বিনিময়ে। টোটকার জন্যে শিকড়বাকড়, পাতা, ছাল, ভেবজ বিভিন্ন উষ্মিভদ্র, ফুল,
ফল বোগাড় করতে হয়। উষ্মিভদের সম্বন্ধে ঠাকরুণ বেরুলে তার সঙ্গী হতে হয়।
পরসা দেয় তার জন্যে। সময় পেলে গল্পস্বপ্নও করে। ঠাকরুণের গল্প পলাতক
পত্রটিকে নিয়ে। ঠাকরুণের অভঙ্গুর বিশ্বাস—ফিরে আসবে, ফিরে আসবে চণ্ডীদাস।
অটলও বিশ্বাস করে, কারণ সে জানে ঠাকরুণের ভিতর ভিন্ন একটা শক্তি আছে।
মেয়েমানুষ সহজ সাধারণ নয়।

শাস্ত্রীঠাকরুণের ভেতরে অটলকে নিয়ে মস্ত নিম্নাংগপর্ব কবে শুরুর অটল জানে
না। স্বনাতীত সম্ভাবনা অনুভব কী অনুমানসাপেক্ষও হয়ে ওঠেনি এত
মেশামেশিতেও। ইঙ্গিত কী তাকে বৈশিষ্ট্য দেওয়ার ঘটনাও নেই। সাধারণ জ্বর
ঠাকরুণের। মাদর বিছিরে চাদর ঢাকা নিয়ে দাওয়ায় শুয়ে, গরু খুলে নিয়ে
বাওয়ার সময়ও পড়েছিল, ফেরত দিতে এসে ওই অবস্থায় দেখে অমকাল অটল,
'ঠাকরুণ—হল কী! জ্বরজ্বালা।'

'হ্যাঁ, শোন তোর সঙ্গে কথা আছে।' অটল ব্যস্ততার সঙ্গে সামনে আসতেই
বকল, 'বস্ এদিকে। অনেক কথা বলার আছে। তোকে একটা দায় নিতে হবে।
আমি আর বাঁচব না।'

'কী যে বল। জ্বরজ্বালা আবার হয় না। নিজে ত কত কী জান।'

'জানি বলেই তো বলছি—শরৎ আমার শিররে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখতে
পাচ্ছি রে—সে আসছে আমাকে নিতে।'

অটলের শব্দে কন্ট হয়।

‘তোমার ছেলে একদিন ঠিক আসবে।’

‘কিন্তু কবে, তা তো আমি জানি না। তার জন্যে এই ঘর, জমি, আমার টাকা গয়না সব তোর কাছে পাচ্ছ ও রেখে যাব। চণ্ডী এলে ফেরত দিবি।’

‘কী বলছ ঠাকরুণ, এ সব আমি সামলাব কী করে।’

‘খুব পারবি। গরুবাগালি তোকে করতে হবে না। বিয়ে করে সসোরও কর, খরচা করবি জমির ধান। সব চালিয়ে যা বাঁচবে তাই রাখবি। তোকে হিসেব দিতে হবে না। তুই স্বাধীন। সব ব্যবস্থা আমি করে যেছি লিখিত পড়িত।’

অটলের গায়ে যেন নরম শিকল এসে পড়েছে। সে শিকল আবার প্রাণময়, দিবিষ্ণুর নিয়ে ঘিরে ধরছে। বেড়ে ফেলতে চায় সে, ‘ও ঠাকরুণ এ ভূমি কী বলছ।’

‘চুপ কর। কথা শোন।’

‘তোমার পায়ে পড়ি। অসামান্য কাজ আমাকে দিও না।’

‘একমাত্র তুই-ই পারবি। তোকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যাব। শোন, এই বালিশের ভেতর হাজার টাকা আছে। মরলে এই টাকাতে শ্রাদ্ধশাস্তি করবি। গয়না আছে ঘরের কোণে মাটির ওলাতে একটা পিতলের বাসে। ও তোর দেখার দরকার নাই—জেনে রাখ। দিগ্‌কে বলে দিয়েছি ও দুর্গার সেবা করবে। আমি চাষে নরেন। ধান তুই বুঝে দেখে নিবি।’

‘ঠাকরুণ ভেবে দেখ।’ অসহায় কাঁপুনি অটলের।

‘ভেবে দেখেই তো করোছি। প্রধান অবিনাশ, গোপীনাথ, চাটুস্লেজমশায়, নুটু কাল আসবে। আমার লেখা কাগজ আমি দেখাব। তোকে সবাই আমার চণ্ডীদাসের প্রতিনিধি বলে মেনে নেবে।’

অটল মাথা দোলায়। শীতসম্মা মূর্খেও সে ঘামছে। বলে, ‘এ আমাকে কী ফ্যাসাদে ফেলছ। গাঁয়ে ঢেক লুক আছে। দায় দিলেই লিয়ে লিবে।’

‘সে আমি জানি। শোন অটল আমি এখন মৃত্যুশয্যায়, না করিস্ না। আমি বলছি তোর ভাল হবে। তোর ধর্ম হবে, পুণ্যি হবে।’ শান্তি ঠাকরুণ বলে, ‘যা ঘরের আলো জ্বালা। তোর ঘরে কেউ নাই। একটা বকনা খালি। নিয়ে আমার গোয়ালে রাখ। আর তুই আমার কাছেই থাক।’

‘কাল তোমার জন্যে ঘোষালভাষারের ওষুধ এনে দেব।’

‘তোকে আর কন্ট করতে হবে না। কাল গাঁয়ের লোক আসবে।’

‘জ্বরে তোমার মাথার ঠিক নাই ঠাকরুণ। ঠিক কাজ করছ না।’

‘তোকে না পেলে ঠিক কাজ হত না। হ্যারে, তুই রামাবণের গম্প জানিস্ !
রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, রাবণরাজা ।’

‘রামরাবণের বৃন্দ ।’

‘শুধু বৃন্দ নয়। রামের সিংহাসন ভরত রেখেছিল। রাম বনবাসে গিয়েছিল ।’
অটল বলল, ‘জানি ।’

‘তুই হালি সেই ভরত। আমি অনেক চিন্তা করে তোকে বেছেছি। আমার চোখ
ভুল করে না ।’

প্রধান অধিনাশ, সদস্য দুলাল, চাটুজ্জেশশাই, বলরাম, পিনাক রায়, গোপালপুরের
গোপীনাথ বিশিষ্টের উপস্থিতিতে শাস্তিঠাকরুণ কথা বলে, তার লেখা কাগজখানা
পড়ায়, সেই করতে বলে সবাইকে, যদিও রেজিস্ট্রি নয়। মৃত্যুশয্যায় বৃন্দার সন্ধান
এখা আদায়ে সকলেই স্বীকৃতি জানায়, অটলের দায়বহনে তারা সহায়তা করবে, গাঁ
যাতে মেনে চলে তাও দেখবে।

কেবল নান্দ চক্রবর্তী আসে না। নামলায় সাক্ষী না দেওয়ার পর থেকেই রাগ।
ঠাকরুণকে এ কাজে বাধাও দিয়ে যায়। নিজের দায়িত্বে রাখার প্রস্তাবও দেয়।
ঠাকরুণ না করেছে।

জীবন বদলে যায় অটলের। সে বিস্মিত হয়েছিল, ভয় উৎসেগে দায়িত্বের শৃঙ্খল
দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল, বেষ্টনকে মনে হয়েছিল সাপপাক, নিদ্রাও চলে গিয়েছিল,
কিন্তু পাওয়ার পর ঝটিকা ক্ষিপ্ৰতায় অনুভবগুণি অবসিত হয়। প্রফুল্ল পাখি শিস
দেয় বৃকের গভীরে। শাস্তিঠাকরুণের আত্মা যেন ভর করে তার উপর কিংবা তার
শক্তি উৎসের মূর্খটিকে প্রসারিত করে দেয়। সে যেন চক্রবর্তী পরিবারের একজন না
হয়েও একজন, অধিকার নেই জেনেও অধিকারী। শাস্তিঠাকরুণ মারা যেতে
বালিশটা সে সরায়, ছিঁড়ে টাকা বের করে, লোক ডাকে, শ্মশানকৃত্য করে, প্রাশ্ণ-
শাস্তিতে ভূমিকা নেয়, চকার নিজের ঘরটিতে তালা ঝোলায়, বকনাটা এখানে
গোয়ালে ঢোকায়, ধানের হিসাব বোঝে কিষাণ নরেনের কাছে, দিগদুকে পুজোর টাকা
দেয়, গাংঠিপাল দেয় নবীনের ছেলেকে। লোকে কথা বলে, ননী চক্রবর্তীরই বেশ
কথা, নানাভাবে বাধা দেওয়া, কিন্তু অধিনাশ সহযোগ সবই কাটিয়ে দেয়। নিজের
প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত ব্যয় করে না, মনে মনে হিসেব রাখে সর্বাক্ষর। দায়বহন
যে এত সহজ, অহেতুক ভয় তাকে কাঁদিয়েছিল ভেবে নিজের শক্তির উপর আত্মবিশ্বাস
হয়। গাংঠিপালের বাগাল ছোঁড়ার অস্তিত্ব ভেঙে পড়বে হয়ে সে দাঁড়ায়।

অটলের গম্প গ্রামজীবনের ধারার মিশে গিয়ে নতুনত্বের কাজ রাখে না, রোমাণ্ড

রাখে না। দারিদ্র্যপ্রাপ্তি, ভোগ সূত্রে ইবা জাগার, ইবার টুকরো কথার তত্ত্ব অমার হিটকে ছাটকে ঘের কেউ কেউ, তাতে ফোসকা পড়ে না গটলের। 'অনাদি চক্রবর্তী'র বেটা, 'শালার তেল কত', 'বামনের পোষাপুত্র' ইত্যাদির সঙ্গে, 'ভোগদখল তোর ভায়েই লেখা ছিল,' 'কপাল করে এসেছিলিস্ মাইরি, কামিরে নে,' অটল শোনে। মানুষ তো কথা বলবেই। তার রাগ হয় না। হয়ত কখনও বলে, পেরত ভোগ করছি ঠিক, দখল দূর না, ঠাকরুণের বেটা ফিরে এলে দখল দেবে। নীরব থাকটাই তার কাছে বেশি। নান্দ চক্রবর্তীও তিত্ত কথা, খায়গ ব্যবহার, বিদ্‌প, বৃণা ইজিত স্থারী রাখতে পারে না। অটলের নির্বিকার্যে হার মানে, কিন্তু মরে না, সময় সময় ছোবল দিয়ে থাকে। রাঙের বিছানায় অটল নিজে বলে, 'দেখো বাবা ধন্য, তুমার স্তো হাজার চোখ, দেখো, ঠিক রেখো আমাকে। ঠাকরুণের কথা বেন রাখতে পারি। বেন লোকে না পাড়ি। এ আমার নিজের খন নয়। আগলছি কেবল। তোমার হাজার চোখে ত দেখে পেছ ঠাকরুণের বেটা কোথা আছে—তাকে খবর দাও। সে এসে বুঝে নিক।' ভাবে চণ্ডীদাস যে কবে আসবে! ঠাকরুণের অনেক বিদ্যো জ্ঞান ছিল, যখন বলেছে আসবে, তখন আসবে নিশ্চয়ই একদিন।

চকার মানুসজন, সেই পরিমণ্ডল, তার সঙ্গে ব্যবহারের কথাবার্তার ভাবভঙ্গী শব্দ সবই এখন বহু দূরবর্তী হয়ে গিয়েছে। অটলের টের পেলে কষ্ট হয়, সেই অটলই আছে, লোকে কেন অন্য রকম আচরণ করে। 'তুই' বলা ছেড়ে এখন 'তুমি' বলে প্রায় লোক, সম্ভান সম্ভ্রমও দেখায়, কথায় গুরুত্ব দেয়।

চকার ভোলাদের ঘরে গিয়ে অটল বলে, 'হ্যাঁরে ভোলা আর যে বাস্ না!'

'টাইম কোথা কাকা?'

'আমি তোদের পর হয়ে গেলাম।'

ভোলা হাসে, 'তুমি এখন গোপালপুরের বামন ঘরের লোক।'

'দেখ বৌদি ভোলা কী বলছে!'

'ঠিকই তো বলছে। তুমি কী আগের পারা আছ ভাই। নিজে মানুষ বুঝতে পারে না, বলল লোকে বুঝে।'

'বৌদি তুমিও আমাকে তাহলে ভুল বুদ্ধ।'

'ভুল কিসের! তোমার আমার কারও ভুল নয়। এটিই নিয়ম বটে। দুনিয়া এরকমই চলছে। মানুষ কী একরকম থাকে চিরকাল!'

দুনিয়ার জায় নিয়মে বেন অটলের কিছু যায় আসে না। আক্ষেপে সে বলে, 'সবাই ভাবে আমি ঠাকরুণের মত মালিক। খায় করতে আসে, কীকি দিতে চায়,

বলে মদ্যমত্ত অনেক ধন পেরেছি, দানখ্যান কর, মালতী টাকা চাইছিল, ভুলে-
বলছিল মদের দাম দে, সরস্বতীপুত্রের চাঁদা চাইতে এসে ছেলেরা বলে, একশ টাকা
দাও, নিজের দিচ্ছ নাকি, বড়ীর এত পেলে—কী করে বড়বাব আমি আগদছি।
জাগালি কী ফসলের মালিক হয়, না জমির মালিক হয় ?

‘ঠিক কথা ভাই। স্বার্থে যা লাগলে মানদ্ব অমন কথা বলে।’

‘তোমার মত সবাই যদি বড়ত।’

মিতি এসে দাঁড়াল, ‘ওমা পছিতে যে সর্ষি উঠেছে। বামনপাড়ার লোক
এসেছে আমাদের চকার !’

অটল বেদনাভরা চোখে তাকায়। কোন কথা বলে না।

‘ভাল আছ ? নিজের ঘর দেখ, চালের বাতা নিয়ে সব উন্নদ ধরাচ্ছে।’

অটল দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বলে, ‘থাকি না, দেখব কী করে।’

‘বড়’ঘর পেয়েছ। এ ঘর থাকল আর গেল !’

ভোলা বলল, ‘শিবপুত্রে কলকাতায় যাত্রা হবে—যাবে ত !’

‘ঠাকরুণের ঘর দেখবে কে ? তোরা সব যাবি ?’

‘হ্যাঁ। দু’দিনই। সিঙ্গিন টিকিট কেটেছি।’

অটল বলে, ‘ও বোদি চা কর।’

‘সে বলতে হবে না। চাপাছি। কিন্তু দুধ নাই—রুচবে ?’

অটলের দৃষ্টি স্বর বের হয়, ‘তুমিও আমাকে দুধছ।’

মিতি বলল, ‘অয় দেখ, যা বলতে আসা। শুনলম, ডালি ওর দিদির দেওরকে
সাপ্তা করেছে। ধজু সিউড়ীতে শূনে এসেছে ?’

ধক্ করে ওঠে অটলের বুক। সে কোন কথা বলে না। শূন্য শোনে ওদের
আলোচনা। হারার এই ঘরের ; বাঁশঝাড়ের কী হবে, সাপ্তা করলে ডালির
অধিকার থাকে না, ছেলেটা বেঁচে থাকলে পেত ইত্যাদি কথা ভোলার মা, মিতি
শোনায়। তার মধ্যেই চা খাওয়া হয়। অটল চকা এসেছিল একটুকরো আনন্দ
কুড়তে। চৈত্রবিকেল লাল আবিব রৌদ্রকে করা দুঃখের মালিন্য দেয়। তার কণ্ঠ
হয়। দিন নয় ডালি যেন পশ্চিমে ডুবছে।

চকা ঘুরে শ্যামদাস এসেছে। স্নান সারা। কপালে গলার উষ্মরক্ত বাহুপাশে চন্দন
ছাপ, কাঁখে সেই কোলা, খজনি, লুঙ্গির মত করে পরা আধা ধূতি, গারে ফতুয়া, মূখ
সেই মধুরতাপ্রাণী, কিশোর কোমলতা রেশমী রুমাল হয়ে উড়ছে কপালে গলার

চিবুকে । খেয়ে চকোর তার ঘরের দাওয়ার অটল বিশ্রাম নিতে দেখেছিল, তারপর ফিরে দেখেছিল চিলটি নেই, আবার ফিরে এসেছে, পারের তলার ঢাকা বৃষ্টি টেনে এসেছে ।

শ্যামদাস ঘর দেখে, সেওয়ার, চাল, বাইরের বারান্দা, একপাশে বাঁধান ভুলসী মণ্ড নিয়ে আয়তকার উঠোন দেখে, উঁকি বাড়িয়ে ককগুলোর ভিতর খাট, বাস-প্যাটিয়া আসবাবপত্র দেখে, গাইজোড়া বকনাটাকে দেখে, ওদিকের পেঁপেগাছ, পেয়ারা আর সজনেগাছ দেখে, তারপর দেখে অটলকে ।

ঝোলা নামিয়ে সিনেট বাঁধান দাওয়ার বসে । উঠোনে পাররা চরছে । সেদিকে চোখ রেখে বলে, 'বেতাস সবই শুনোছি, রাধেকৃষ্ণ, এখন চাক্ষুষ হল বাইরের রূপ— অস্ব'রূপ বাকী থাকল । ভিতর দেখা কী, চাটখানি কথা ?'

'ভেতর কী দেখবে ! দিব্যি ছিলম, কামেলায় আছি ।'

'কামেলা বলছ বটে, তবে সুখও ভোগ করছ, তোমার কথার গম্ব শুন'কে ব'ঝছি । তবে হ্যাঁ, পরীক্ষিতে পড়েছ । কী লিখছ কে জানে ! খাতা দেখবে এগজামিনার, আমরা দেখব পাস না ফেল ।'

'তোমার কথার হালহন্দ পাই না ।'

'আমিই কী পাই নাকি যে তুমি পাবে ! রাধেকৃষ্ণ !' শ্যামদাস হাসে । বলে, 'ভাল কথা, ডাকাত জগা জেলে আর তুমি এখানে । জগা তোমাকে টানতে পারল না আর তুমিও ওকে রাখতে পারলে না ।'

'কথা শুনলে ত রাখব ।'

'ধম্মকথা কে শুনতে চায় । তবে তোমার হার ।'

জগার অধমের নদীতে বান, ধম্মনদী শুনকো । অটলের মনে পড়ে । ব্যগ্র হয়ে সে বলে, 'জান ত সেদিন তোমার চালের ভাঙত খেয়ে বেরুলাম্, তুমি শূন্যে থাকলে, যেতে যেতে নিজের মধ্যে ধম্মনদী দেখতে পেয়েছি ।'

'ভাগ্যমান তুমি, ব'দকে আনন্দ নদী দেখেছ । সে ধম্মনদীর জল, আহা-রে আনন্দ, বাতাস উধানের আনন্দ, আলো আনন্দ, দুকুলের মাটি আনন্দ, দ' পাড়ে গাছ আনন্দ ।

'কলকলানি ছলছলানিও শুনোছি ।'

'কলকল ছলছলও আনন্দ । খালি আনন্দ লহরী ।'

'কিন্তু আর শুনি না, দেখি না । কেনে ?'

'এ রহস্য জানা নাই বাবাজী । রাধেকৃষ্ণ । তবে রইছে তোমার মধ্যে । এখন ' তখন দেখতে পেলো শুনতে পেলো তুমি যে আর মানুষ থাকবে না ।'

অটল নিবোধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

শ্যামদাস বলে, 'ছাড়ান দাও উসব। পরীক্ষে কেমন দিছ? বুকতে পারলে না পরের জিনিস নিয়ে পড়ে আছ, মনে হচ্ছে না তোমার নিজের?'

'তা কেনে হবে? ঠাকরুণের বেটা এলে নিশ্চিন্ত। লোকে আমাকে দুষছে। কিন্তু তুমিই বল ঠিকঠাক তুলে দিতে হবে কী না। পরের ধন উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অধিকার কোথা, হচ্ছে থাকলেও দিতে পারি কই!'

শ্যামদাস বড় বড় চোখ করে শোনে, 'তোমার নিজের ঘর?'

'তালা ঝুলিয়ে এসেছি। কাজ শেষ হলে ঘেঁরে ঢুকব উখানে।'

'বিয়ে সাদি করবে না?'

'ঠাকরুণ বলেছিল করতে। কিন্তু ওঁদিকে মন দেবার অবসর কুখা? কত কাজ! গাইয়ের শরীর ভাল নাই দেখতে হচ্ছে, চাবে নরেনের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে, দিগদু ঠাকুরের কথা শুনতে হচ্ছে, ঠাকরুণের সংসার নিয়েই সামাল সামাল। আবার বিয়ে করলে—'

শ্যামদাস খামিয়ে দেয়, 'রাধেকৃষ্ণ তাহলে গাঁয়ে ভিক্ষেট সেয়ে নই।'

'এখানেই সেবা করবে।'

'সে আর বলতে! আরোজন কর বাবাজী!'

'দেখো সেদিনের মত পালিয়ে যেও না আবার।'

শ্যামদাস বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন কথা বলতে চেয়েছিলে, শোনা হয়নি। পরে যখন তখন খিঁচ খিঁচ বাজত বটে, বলতে পার তার লেগেই তাড়াতাড়ি আসা!'

ভলির কথা বলতে চেয়েছিল। সে তো এখন অন্যের বৌ। বছর ঘুরে গেল। কথা শেষ। অটল মাথা নাড়া দিল, 'সে কথা কী আর পড়ে আছে।'

'উড়ে গেইছে কালের ডানায়! রাধাকৃষ্ণ। তবে সৃষ্টি ত হয়েছে নতুন কথা— তাই বলবে।' শ্যামদাস দাঁড়ায় না, 'চাল তাহলে।'

শ্যামদাস ভিক্ষে করে ফিরে আসে, তৃপ্তি করে খায়, রাত কাটায়, নানান গল্প হয়, তারপর সকালে, আবার আসব, রাধেকৃষ্ণ বলে ঘোঁরয়ে পড়ে। পায়ের তলায় চাকা, ড্রাইভার মৈদিকে নিয়ে যায়, যাবে। অটল ভাবে, আহা তার পায়ের তলায় যদি অমন চাকা থাকত, অমন যদি ঘুরতে পারত।

শাঁখার বিয়ের সংবাদ পায় অটল একদিন। শিবপুর থেকে সাইকেলে পাজামা শার্ট পরা একটা ছেলে এসে বলে যায়। বন্ধুবার বিয়ে। শাঁখা বেতে বলেছে।

'শাঁখার বিয়ে!' অটল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

‘হ্যাঁ ওন নলহাটির মামী ঠিক করেছে। তাহলে চললুম’—বানে।’

জেলোটা বোরসে বাওয়ার পর অটলের মনে হর, ভালবাসা তাহলে এমন! এদিকে
কগা জেলে রয়েছে। খবরও পাবে না। বিবাদের কালো ডানা আবৃত করে দেয়
সব জাকসা।

শাঁখার বিরুদ্ধে অটলের বাওয়া হয় না। কালী ভট্টাচার্য মারা গেলেন সেদিন
বিকেলে। নব্বইয়ের মত বয়স হয়েছিল। প্রবল দাপটে মানুষটি জীবদ্দশায় হয়ে
শব্যালয় ছিল দু'বছর। সংসার দেখত না। সেবার জন্য পালেদের বেবতীকে রাখা
হয়েছিল। মানুষটার স্মৃতিশূন্য হয়ে গিয়েছিল, চেতনাও ছিল না, অজ্ঞানও গানের
লোকের কাছে ছিল না। মৃত্যু এসে জানিয়ে দিল কালী ভট্টাচার্য বেঁচেছিলেন।
অটলের কোন ভূমিকা নেই, তাকে শ্মশানবাগীচ হতে হবে না। সন্ধ্যার অনেক
পরে বন্ধুদের শ্মশানে মড়া নিয়ে বের হল শবদাতার দল। সে কেমন করে
বিরোধী বায়। রাতে শুরে তার মনে হল, শাঁখা সুখী হোক। ঠিক করেছে
মেয়ে। নিজের জীবন এক অমানুষের পায়ে বলি দিলে মুখামিই হত। সে শিবপুরে
গিয়ে দেখা করবে।

অটল শিবপুরে গিয়ে শাঁখার দেখা পায় না। শব্দরবাড়িতে শাঁখা। তারপরও
বারকরেক সে যায়, একে ওকে জিজ্ঞাসা করে শাঁখা এসেছে কী না! না, খবরও
জোটে না। শাঁখা নিজেও আসে না, কী খবর পাঠায় না। সূত্র আছে শাঁখা ভেবে
অটলের মন থেকে শাঁখা মুছে যায়।

চণ্ডীদাস ফিরে আসে না। বছর পার হয়ে যায়। গাঁ-মানুষের মধ্যে ওই সংক্রান্ত
কথাও নেই, কিন্তু অটলের মধ্যে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন ধারণার শিখাটি থেকেই
যায়। তার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার করশা লুঙ্গি, গেঞ্জি, শার্ট,
পায়ে হাওরায় চম্পল বুঝি সে বামনপাড়ারই মানুষ। চকার জীবনদীনতা,
অভ্যাজ প্রেশীভূতির হীনম্মন্যতাবোধ এখন নেই। প্রধান অবিনাশ, সদ ব্যবসায়ী
বন্ধু, সহস্রকম্পটর, নটগেরস্ত পিসি তারুবালা, অন্য ঠাকরুণেরা অটলকে
তাদেরই একজন মনে করে। বামনঠাকরুণ অটলকে সব লিখে দিয়েছে, এটাই
কথা। অর্ধ এক ধরণের কৌলিন্য দেয়। কথাবাতাতেও পরিবর্তন এসেছে
অটলের। ধর্ম পরিভাষা করেনি, ধর্ম মানা কিংবা ভয় বাই হোক, তার মধ্যে
সম্মান রক্ষাশীল। বুদ্ধিবিচারের বিকাশ ঘটে, ব্যক্তিও এসেছে, বাগানের বা
ছিল না।

শব্দ নান্দ চরিত্রী ব্যতিক্রম। মান্দবটা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, শব্দ-
নান্দ নয়, ওর ছেলে বৌ ঘরের কিম্বাণ বাগালকে পর্বত বিঘাত করে রেখেছে। এড়িয়ে
গেলেও কাঁপায়। অটলকেই গা বাঁচাতে হয়, আঘাত সহ্যেতে হয়।

গাঁয়ের তহশীলদার, সরকারী কর্মচারীর স্বীকৃতি পাওয়ার পর ভূমি-সহায়ক
ভূবনপতি রায়। রাজনা আদায় করে জমিজমার। জমির বিন্দুর হুন্ডেজাতি, শরিকী
ভাগ, মামলা মোকদ্দমা, মারদাঙ্গা, দলিলপত্রচা, দাগ খতিয়ান ইত্যাদিতে টাইটুশ্বর
অভিজ্ঞতা। বলে, 'জমি বার অধিকারে সেই মালিক। কাগজের দাম খতম। ভোগ-
দখলই সব। মাটি থেকে কাউকে তোলা সহজ কর' নয়। বগার তো কাগজে কলমেও
অধিকারী। না বর্গা হলেও ভোগেও রাইট জন্মায়।'।

অটল এসব শোনে, তাকে শোনান হয়, খুচরো প্রাপ্তির জন্যে তোরাজে অধিকারের
গতীটিতে কাঁপানর প্রলোভনও জাগান হয়, তবে বর্গা অপারেশন ক্যাম্প বসছে না,
অটলও নাম চাপাতে যাচ্ছে না, চণ্ডীদাসও আসছে না তাকে উৎখাত করতে। কিন্তু
পরশন ভোগের সচেতনতার মধ্যেও নিঃশব্দ অধিকার রস নিষিদ্ধ হয়, রস পদ্রু হলে
চটচটে আঠা, তখন লড়াই, অজস্র জটিলতা, ক্রোধ, হিংসা। অটল না চাইলেও
ঠাকরুণের ঘরের প্রতি বস্তুই মানসিকতার প্রভাব ফেলে, মারা বিভারিত হয় অজায়ে,
কঠোরের মোহের জন্ম দেয়। অটল বোঝে না। বোঝার সজ্জা হারানর জন্যই
তো মান্দবের এমন জীবন বৈচিত্র্য।

শিখা সজাগ করে দিতে অটল শিখাশক্তির অন্য রকমের প্রচণ্ডতার আক্রান্ত হয়।

শিখা বেচু ঘোষালের মেয়ে। একান্তরে বেচু খুন হয়। সুদ বন্ধকীর কারবার
ছিল। বেচু খুনের সঙ্গে সংসারও খুন। সংসারে সাহায্যকারী ভাই কিংবা অন্য
নিকটজন ছিল না। স্ত্রী অনিতা তিনটি মেয়ে নিয়ে ঘোর দুর্দিনে পড়ে। সামান্য
জমির উপর নির্ভরতা। মন্ডিভাজুনি সাজে। বড়মেয়ে রেখার বিয়ে বিনাদানে
বিনাপণে হয়ে যায়। বেচু ঘোষাল রূপবান পদ্রুই ছিল। তিন কন্যাই রূপবতী।
মেজ লেখা পনের বছর বয়সে মারা যায়। ছোট শিখা। সেরা সুন্দরী সে।
অভাবের সংসারে সুন্দরীর উপর বড়কাপটা বেশি আসে, অনেক পদ্রুবেই কামনা
আগুন জাগে, নানাভাবে গ্রাসবাণীর জাল এবং ফাঁদের নির্মাণ চলে, পা পড়ে
আটকানও ঘটে থাকে। রূপবোবনের সচেতনতার সঙ্গে বাড়তি সুযোগে তা ব্যবহার
করার প্রবৃত্তি শিখার মধ্যেও কিশোরী অবস্থাতেই গড়ে ওঠে। শরীরের কৃথা,
সাজগোজের কৃথা, ভাল খাদ্যের কৃথার সম্মেলনে গাঁয়ের বৃদ্ধকবলকে তার
চারণাশে নৃত্যরত করার খেলা চালায়। তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হয়ে যায়

নারক। বন্ধুর বড় ছেলে ফটিক। বন্ধু দু' পুরুষের খন, জমি, সুদের কারবারে ফাঁপান অবস্থা, গাঁয়ের রেশন ডিলার, ভোটে না দাঁড়িয়েও পত্তারেতে প্রভাব প্রতিপত্তি। খনবৃদ্ধির নেশায় প্রেমের দেবতার অস্তিত্ব তার কাছে বিস্ময়। প্রেম পেট ভরাবে না, পেট ভরাবে টাকা, অন্ধকারে সব মেয়েমানুষই সমান, রূপ তো বাইরের লোককে দেখানর জন্য ইত্যাদির সঙ্গে বন্ধুর পুরুষাতার এও জানা আছে বেচু ঘোষালের ছোট বিটি কার কাছে লাড়ি নিয়েছে, কে মিষ্টি খাইয়েছে, শিবপুরের মোড়ে কার কার সঙ্গে ঢলিয়ে বেড়াচ্ছে। শাসাল বলেই ফটিককে একটু বেশি আঁকড়েছে এই যা। ফলে লক্ষাধিক টাকার দেনাপাওনা নিয়ে ইলামবাজারের এক কাঠের ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেয় চটপট। কালো মোটা মেয়ে, ফটিক না করতে পারে না। শিখা ব্যবস্থাও সে করে ফেলে। বোলপুরে রেলের এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পোস্টিং অ'ডালে—হীরেনের সঙ্গে সম্বন্ধ দেয়, সহায়তা করে; বিয়ে হয়ে যায়। খুব সহজে সমাধান হয়ে গেল অঙ্ক, এমন আশ্চর্য্যমি বন্ধুর অবশ্য দু'বছর মাত্র স্থায়ী হয়। শিখা গাঁয়ে ফিরে আসে। তার গর্ভে কোন সন্তান আসেনি। স্বামী বরাবরই এক বিহারী বিধবা বৃদ্ধীতে আসক্ত ছিল। সেটা বেড়েছে। ফলে মায়ের ঘর। ডিভোর্সের মামলা করবে এরকম মতলব।

শিখার যৌবন দূর্ভাগ্যের ঘাটতি ঘটেই দু'বছরে। ধবধবে ফরশা বর্ণ, মাথায় ঘন কালো চুল, নীল ঘেঁষা চোখ, মৃদুস্বভাবের শৈল্পিক টান, লাবণ্য, রতি ছন্দের চমক স্তন কোমর নিত্যস্ব পুরুষ কামনার শিকড়ে টান এবং উৎকণ্ঠ করার যে শক্তি ছিল তাতে চাতুর্ঘ্য শিকণশৈলী আরও গাঢ়ভাব এনেছে। রূপবতী বাধিনীর শিকার কোশল নীল চোখে জ্বলে, নিজের না পুড়ে অপরকে পোড়ান অগ্নিসত্তায় ভাস্কর হয়।

ঠাকরুণের ঘরের পাশেই বেচু ঘোষালের ভিটে। মাটির ঘর, খড়ো চাল মাটির পাঁচল ডিঙিয়ে ঠাকরুণের উঠানে ডালপালা বিস্তৃত করেছে। পাতকুম্বোর কাছে পেরিপেগাছ। মাঝে সামান্য পাঁচলের ব্যবধান ঘুঁচিয়ে শিখা আসার পর অটলের সঙ্গে ও বাড়ির বোগাযোগ বেশি হয়েছে। অনীতঠাকরুণ এটা ওটা ফাইফরমাস করাত, এখন এটা সেটা নিতে আসে, চাল ধার দেওয়া থেকে কাঁচালস্কা, শোধও দিয়ে যায়, আবার কোন কোনটি ভুলে যায় কিংবা দেয় না, অটল চাইতেও পারে না। শিখা প্রায় এসে গল্প করে। কথা সেই বলে বেশি। ইলামবাজারের কথা, অ'ডালের কথা, তার স্বামীর কথা, বিধবা বিহারী বৃদ্ধীর কথা। শিখার মূখের আকটাক নেই, সে তার ক্রোধ, স্বামীর পরম্পরী আসক্তি সবিস্তারের সঙ্গে তাদের দাম্পত্য

ব্যবহারের খুঁটিনাটি কল্যাণেও ঠোঁট সমান সচল রাখে। অটল জ্ঞাতে নিচু, বামুনের মেয়ে ঠাকরুণ, তার স্পর্শযোগ্য নয়, কামনা জাগা পাপ, নারী বিষয়ক কথার রস আশ্বাদনও অন্যায় সে বোকে, সম্ভ্রমবোধ রাখে, কৃতার্থ হয় ঠাকরুণ তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে না বলে, কিন্তু শিখা যে সমাপ্তরালে আনতে চায়।

‘তুমি আমার দিকে তাকাতে পার না কেন, সুন্দরী বলে।’

‘কী যে বল। তুমি ঠাকরুণ বট, অমন করে আমাদের দেখতে নাই।’

‘দেখবে। আমি বৃদ্ধের পারি তুমি ভয় পাব। অথচ দেখতে তোমার খুবই ইচ্ছে হয় ভেতরে ভেতরে।’ ‘অনেকদিন তো বৌ মরেছে। আর কোন মেয়েমানুষের কাছে যাওনি?’

‘না।’ অটল ফ্যাকাশে মুখ তোলে।

‘যেতে তো ইচ্ছে করে। বেটা ছেলে বট।’

‘ওসব কথা বলতে নাই ঠাকরুণ, অধম হয়।’

‘ইস্ অধম! ইচ্ছেকে চাপা দিয়ে রাখাটাই পাপ।’

অটল চোখ তোলে। বৃবতীর ঠোঁটে হাসি, আঁখিতে রহস্যময় কামঘনম্ব। সে চক্ৰ নত করতে পারে না, যেন সম্মোহন শক্তির পরিধিতে প্রবেশ করেছে।

‘তুমি নিজেই নিচু জাত ভাব। জাত আবার কী। পুরুষ বট। জান তোমার জন্যে আমি ভাবি। আচ্ছা, ‘লোকে তো আমার বদনাম করে, বলে নষ্ট মেয়ে। বলে না?’

‘বলে নাকি?’

‘সত্যি কেউ বলে না?’ শিখা বিস্ময় তেনে ছেড়ে দেয়, আমি নানাজনের সঙ্গে মিশি। সাজিগদুজি, বেটাছেলেদের সঙ্গে হাসাহাসি করি। ত্রোনার রাগ হয় না?’

‘রাগ! আমার রাগ কেনে হবে ঠাকরুণ!’

‘উঙ্ করো না তো, আর ঠাকরুণ কিসের! শিখা বলতে পার না। মনে মনে ত বল। আমি বৃদ্ধি না ভেবেছ।’ শিখা হেসে ফেলে কাচের চুড়িপরী হাত বাজায়, ‘ভয় নেই গো, কেউ জানবে না।’

শিখা শূদ্ধ কথায়, চাউনিতে, শরীরের মৃদ্রায় নয়, রাস্তাকরা তরকারি দিয়ে যায়, চা করে দেয়, নিজেও খায়, একটা ব্রাউজ কিনব বলে টাকা নেয়, ‘ও মা ঘরের কী দশা’ বলে গদ্বিছিয়ে রাখে। যখন তখন আসায় ঘরে ছিড়িয়ে যাওয়া মেয়েলী গন্ধে অটলের নিজেকে প্রতিরোধের শৃঙ্খলটি ক্রমশঃ আলগা হতে শুরু করে।

শেষ অগ্রহায়ণের বিকেলের মরা রোদে দাঁড়িয়ে যৌবন সোনার মেয়ে একদিন বলে, ‘সন্ধ্যবেলায় তোমার ঘরে ফটিকদা আসবে আমার সঙ্গে গল্প করতে, বৃদ্ধেছ!’

অটল ভাবে, তাহলে উদ্দেশ্য এটা। সম্পর্ক গড়ার মধ্যে এ মন্তব্য কাজ করত। জমি তৈরী করছিল মেয়ে, অটল বিব্রত বোধ করে, 'লোকে আমাকে দুষবে।'

'দোষ করব আমি, আর দুষবে তোমাকে! কী যে বল। কেউ টের পাবে না অশ্বকারে। বেচারী আমার জন্যে কাঁহিল।' শিখা শব্দ করে হাসে। শরীরে মোচড় দেয়, নীলচে চোখের লু রেখার চমৎকার এক বিভ্রঙ্গ গড়ে ওঠে। তারপরই উৎসারিত হয় বেদনাঘনস্ব, 'আমারও শরীর আছে, বেঁচে থাকতে হবে, ফটিকদা ডিভার্সের মামলায় সাহায্য করবে যে দেখবে তাকে দেখতে হবে না—বল।'

অটলকে বৃত্তি মানতে হয় কিংবা এও এক মন্তব্য—স্বরপাতে বিমূর্ততার স্নান হয়। তারপর রুদ্ধতার কক্ষটিতে নারীপুরুষের মিলনপর্বের কথার অবোধ্য আভাস, টুকরো শব্দ কী নৈশশব্দা থেকে তার মধ্যে চিত্রণ ঘটে উদ্ভাস সঙ্গমভ্রীড়ার নানান মূদ্রা, যা জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে চাক্ষুষ করে, তার পৌরুষ ইন্দ্রিয় ফেটে পড়তে চায়, ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, শীতল সন্ধ্যা দগ্ধ করে, অবৈধ, অন্যায, ধর্ম অনুগামী নয়, পাপাচার বোধে আসে না। কামদেবের পুষ্টিত ধনুশরের উপবৃষ্টি হানায় স্বেদ, আরও মাদকতায় সে কাম বাণাঘাতে ধস্ত হয়। ওরা চলে যাবার সময় কী যেন বলে যায়, কানে ঢোকে না। অবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বিছানায় শুয়ে সে মনেপ্রাণে শিখাকে কেবল কামনা করে যায়।

শিবপুরে বিকালের বাসে ডাল নেমেছে, চকা আসবে। চালের দোকানের বেষ্টিতে বসে ছোট কাচের গ্রাসে চুমুক দিচ্ছে। অটলের দেখামাত্র ঝিকঝিকির, চোখেমুখে চিনতে না দেবার জন্যে আলোআঁধারি রঙের দ্রুত প্রেক্ষপণের চঞ্চলতা—স্থির হতে সে যেন চেনে ডালকে। শীতের দিনের স্বল্পায়ু বিকেল হিম কাঁহিল, শেষ রোদের লালিমায় দঃখছায়া, যাংসে রুদ্ধশব্দকতায় ধূলিমালিনতায় প্রকৃতির বিমর্ষজড়তা, যা মানুষ্যে প্রভাব ফেলে, অটলের সেটা মূছে চনমনে ভাব আসে। সে দেখে ডালর ঘাড়ে খসা ঘোমটা, ঝকঝকে মৃৎখণ্ডল ভরাট, তেলাভ মাংসল, গলায় সোনালী রেখা, কানে দুল, হাতে চুড়ি। বয়সের নিয়গামিতার রূপ যেন ঢাকা আঁচল সরিয়েছে, গোলাপী শাড়ী রাউস, লাল চাদর, পায়ে চটিতে নতুন বো মানুষ্য।

অটল সামনে হতেই ডালর ঠোঁটে কাচের গ্রাস আটকে যায়। 'কখন এলে?' জিজ্ঞাসায় বলে, 'এই মাস্তর। সিউড়িতে অনেককণ বসে থাকতে হয়েছে, বাস ছিল না। এই যে দেখ—' বিপরীতে বসে থাকা যুবকটির দিকে তাকায়। অতি ব্যক্ততা অতি সহজতা ফোটে নড়াচড়ায়। বলে, 'চকার লোক।'

বুঝকিটি হাসে। কালো বর্শা খোদাই করা মৃৎচোখ, শ্বাস্ত্রাবান, মাথায় কোঁকড়ান
চুল, হাফশাটের উপর নীল সোয়েটার, গলায় মাফলারের পাঁচ, হাতে ঘড়ি, কালো
মোজাপরা পায়ে বুট জুতো। ভয়ভা দেখায়, 'চা খাবেন?'

অটল না বলার আগেই ডলি বলে, 'বল না চা দিতে।' অটলকে দেখে, 'সিউড়ীতে
চাঁদুর কাছে শুনলম বামুনদের ঠাকরুণ সব তোমাকে দানপত্র করে দিয়েছে।'

'আমি দেখভাল করি। ঠাকরুণের ছেলে ফিরলে সব উর।'

'আবার ফিরেছে। বেঘোরে কোথা মরেছে দেখ গা।'

ডলি শ্বামীকে নিয়ে অটলের সঙ্গে হাঁটে। একবার এসেই সে কত খবর সংগ্রহ
করে ফেলেছে। জগার জেলপর্ব শেষ হয়ে আসছে, ধীরের সাজা কম ছিল, ছাড়া
পেয়ে গিয়ে না এসে বোনের বাড়িতে উঠেছে। পেছাদা খোঁড়া পা নিয়ে ভিক্ষে করে
সাঁইথিয়া বাতারে, মালতীর বড়মেয়ে পাঁচলিয়ে গিয়েছিল মৃঁচদের পবনের ছেলের
সঙ্গে। অটল সব শোনে। গোপালপুরের বামুনপাড়াকেন্দ্রিক জীবন, ঠাকরুণের
দায়িত্ব বহনের মনতায় এ সবই গুরুত্বহীন। ডলি এসেছে ঘর বিক্রি করে টাকা
নিয়ে বাবে। হারার যখন কেউ নেই, সেই তো মালিক। এও অটলের প্রতিক্রিয়াহীন
শোনা কেবল পাশে হাঁটিতে হাঁটিতে। তবু ডলির সৌন্দর্য না বলে চলে যাওয়ার
অভিমান, ভালবাসার স্মৃতিভাষিতা, অন্য পুরুষের নারী হয়ে যাওয়া প্রেমিকার
জন্যে প্রণয়শোক, রূপ ফিরে পাওয়া ডলির যৌবন ভোগ কামনা মিলেমিশে সে স্পষ্ট
তের পায়ে না। কিন্তু তারই ক্রিয়াশীলতায় অভ্যস্তরে তুমুল আলোড়ন তোলে, যার
বিস্ফোর নেই : আঘাতের প্রবলতা আছে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘাস আছে, ঘরে ফিরে
সন্ধ্যাবেলায় যা কাশা হয়ে ধরে।

শিখা এসে বলে, 'ওমা আলো জ্বাল নাই। আঁধারে বসে আছি। ঘর সব খোলা।
ঠা'ড়া হাওয়া দিচ্ছে। রান্নাবান্না করবে না?' সাড়া না পেয়ে শিখা আলো
জ্বালায়। জানলা বন্ধ করে। বন্ধে বসে থাকা অটলকে দেখে। বলে, 'কী
হয়েছে? গায়ে চাদর নাও নাই।' শিখা চাদরটা বাড়িয়ে দেয়, 'রাখিতে ইচ্ছে নাই?
রুটি খাবে, বাঁধাকপির তরকারি আছে। দুপুর থেকে মায়ের জ্বর। খাবে না কিছু।
কাল আমাদের বাসি রুটি খেতে হবে। দাঁড়াও—নিয়ে আসছি আমি।'

শিখা রুটি তরকারি নিয়ে আসে। অটলকে জোর করেই খাওয়ার ধমকানি
দিয়ে। শিখার এমন হৃদয়তা, স্নেহকাতরতা, খেতে দেওয়া, জিজ্ঞাসায় উত্থল দরদ
অটলের অন্তরকান্নাকে আরও বিগলিত করে।

'এই দেখ, বোকাম মত কাঁদে দেখ।'

অটলের সব হীন্দুর মন্থিত হয় শিখার কথায়। প্রবল অসহায়ত্ব সহসা দৃঢ়তা অবলম্বিত যখন হয়ে যায়, শূন্যতার নেমে আসে সম্পদ, একাকিত্বে প্রিয়জনের হাত, অপ্ৰত্যাশিত এবং অসম্ভবকে ভুঙ্ক করে, তখনই শূন্য মানুষ এরকম কাঁদতে পারে।

শিখা কোনদিন স্পর্শ করেনি, আজ সে মানুষটার মাথার হাত রাখে, চুলে বিলি কাটে, তারপর দু'হাতে তুলে দাঁড়ি করার, বৃকের ঘনতায় শ্বাস ফেলে বলে, 'কৈ'দ না, আমি তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব।' যেন নারী জানে অটলের দুঃখ অটলের অপূর্ণতা, কায়ার গভীর গোপন উৎসটির সম্ভান। পুরুষকে বেণ্টন করে কান্না মুছতে উজ্জীবিত করতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মূদ্রা গড়ে, পায়ের বড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে দীর্ঘ হয়ে গলায়, কাঁধে, চিবুকে, ঠোঁটে চুম্বনে লাল্যাসিক্ততায় প্রানিত করে দেয়।

অটল টের পায় তার সব দুঃখ শূন্যে নিচ্ছে নারী। বিপুল আনন্দস্রোত বইতে শুরু করেছে শরীর। নারীশরীরের চাপে, উষ্ণ নরম স্তনসম্পর্কে সে মন্থ রাখে। শ্বাসবন্ধের মধ্যে সে অন্তর্ভব করে ধর্ম'নদীর বহমানতা শরীরের নখায় থেকে মস্তিস্ক অবধি। ক্রমে বয়স হারিয়ে এক শিশু হয়ে যেতে থাকে সে। কলকল ছলছল করে ধর্ম'নদী বইছে। উজ্জ্বল আলোকধারা, দু'পারে সবুজ বনানী, ডেউয়ের মকুটে লক্ষ কিরণ—অটল সেই কুল ধরে চিনিকে না, ডালিকে না, শিখাকে না, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার দুঃখী মা কোমরে ঝুড়ি নিয়ে আদুল গায়ে খোলা চুলে আসছে, সে ছুটে চলেছে মায়ের দিকে, বোধিতে কেবল বহুদূর আগে হারিয়ে যাওয়া 'মা' ধান।

শিখা শরীর জানে, পুরুষপ্রবৃত্তির অশ্বতায় রূপযৌবনের হননকামী ক্রিয়ায় ছিন্নাভিন্ন হতে জানে, পুরুষ কঠিনতায় নিজের দেহক্ষুধার যন্ত্রণার সুখস্বাদ জানে, কিন্তু নরম হাড়গোড়ের মাংসল শিশুর নিবিড়তায় তার সত্তায় যে জাগে ভিন্ন ধারা, তাকে রূপান্তরিত করে, অন্য বোধ জাগায়, অন্য আনন্দ অবগাহন বিস্ময় উদ্ভব ভাসমানতায় পৌঁছে দেয়, এ আশ্চর্য জানা ছিল না। সে আদর করে, চুম্বন দেয়। এক সময় বলে, 'ছাড়। বোকা ছেলে।'

পরের দিন ফটিক আসে সম্বেবেলায়, শিখা আসবে। শিখার আসা হয় না, ঘরের উঠানে নামতেই ওকে সাপে কাটে। ওমা, বাড়ুফুক, ওর মায়ের কান্না, লোকের হা-হুতাশ, শিখা বাঁচে না। অটল শোনে, দুঃখ পায়। স্বর্গপিণ্ড মোচড়ান কন্টে সে জ্বলন্ত হয় না, অভিসম্পাত দেয় না, সহস্রচক্র দরবারে সে অবনত হয়ে থাকে।

৮

একমুখ গোঁফদাড়ি, মাথার চুল ঘাড় বরাবর, হাতে বালা, প্যাণ্টের উপর রঙচটা হলুদে পুরু গোঁজ, বুকে বর্ণস্নান ফুল, ঘরের উঠানে এসে দাঁড়াতে অটল চিনতে পারে না। একটু আগে বীজধান নিয়ে গেল নারান, গরু খুলল বাগাল চাকু, সে রান্নার আয়োজন করছে, উঠানের ওধারে তোলা উনুনে কয়লা লাল শিখার সঙ্গে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে। কালবৈশাখীর দাপটের পর গ্রীষ্ম মশালের পেখম মেলা রোসে তাপহ্রমী উজ্জ্বলতা।

‘কী অটলবাবু কেমন আছেন? চিনতে পারলেন না তো! আমি চণ্ডীদাস। শিবপুত্রেই শুনলাম আমার সম্পত্তি ভোগ করছেন। কী ভেবেছিলেন আমি ফিরব না! এ কী! একটা চেয়ার কী টুল নেই, বসব কোথা!’

অটল বাস্তব হয়ে একটা কাঠের টুল এনে দেয়। বলে, ‘এই তো, বসুন। ঠাকরুণ যদি বেঁচে থাকত!’

‘তাহলে তুমি কী করে ভোগ করতে বাপ! যাক্ এবার তো ছাড়তে হবে।’

‘ছেড়ে দুব। আপনার ধন। এ সব কী আমার! আগদাছিলাম এই মাস্তুর।’

‘ছাড়তে কষ্ট হবে না?’

‘কষ্ট কিসের লেগে হবে? অটল বলে মদুখ পড়ে। দাড়িগোঁফের এই চণ্ডীদাস এতদিন কোথায় ছিল? মাকে কেন কষ্ট দিল!’

‘হিসেব ঠিক আছে তো, না বেড়ে ফাঁক করে দিয়েছ।’

‘সব ঠিক আছে, সব বদ্বিন্ দুব। তাহালে একটু চা করি।’

‘জা. কী। আমাকে তো রেঁধেও খাওয়াতে হবে।’ দাবড়ানি চণ্ডীদাসের যেন ভেতরের বদ্বন্ধ বিরক্তি ফেটে বেরিয়ে আসে, ‘এরকম হাঁদারাম তুমি কেনে বল দেখি! নিজের আখের গুছতে জান না? এরপর খাবে কী? চকার ঘরের দশা যা করছে থাকতে পারবে? চিরকাল শালা বাগাল ছোঁড়াই থেকে গেলে। আমি এসে বললাম, চণ্ডী বটি, বিশ্বেস করে গেলে। চণ্ডী এলে, পথে কেউ দেখত, শিবপুত্র মোড় থেকেই চাউর হয়ে যেত। উকে পাড়ার সবাই চেনে, তোমার মত কেউ নয়, চেনাকেই চিনতে পার না!’

অটল সরল জিজ্ঞাসায় যায়, ‘তাহালে আপদনি কে বটেন?’

প্রচণ্ড রাগ প্রবল কোভের বিস্ফোরণ ঘটে, ‘চিনতে পারছ না? গলা বুঝছ না? দেহেও মদুখ দেখেও মনে হল না?’

‘জগা!’

লম্বা শ্বাস ফেলে জগা বলে, ‘হৃদয় হল?’

‘কবে ছাড়া পেলি?’ অটল যেন ভাসমান হয়ে এতক্ষণে জন্ম পায়। পা রাখতে পারে নিজের। জগা ফিরে আসার আনন্দ রেখাটির হিম্মত সূখ দেয়।

‘দিন দশেক হল। তুমি মদুখে’ আছ বামুন ঠাকরুণের দন পেয়ে শুনেন আনন্দ হয়েছিল। টাকার গুণে সম্পত্তির গুণে ভাবলম হয়ত নিজের গদুহুতে শিখেছ। বদলে গেছে। এ দেখছি সে গদুড়ে বালি। তুমি মাইরি কী চিহ্ন কে জানে! সম্মোহিত লও, ব্যাম ভোলানাথ বলে নেটি পরে ঘুরছ না। দিবা শাসে জলে রইছ, অথচ চিটে গদুড়ের চিটেন নাই। চণ্ডী তাঁড়িয়ে দিলে যে ভিক্ষে করে খেতে হবে। বুঝলে, এখনও সময় আছে গদুছিয়ে নাও, নিজের বলে কিছু সরাও।’

‘হীর করতে বলাইছ! ডাকাতির শাস্তি ভোগ করে এসেও শোধরাইল নাই?’

জগা অগ্রহা করে কথাটা। জেল ভোগের কালো ছায়াহীন অনুশোচনাহীন মদুখে শয়তান আরও বলশক্তি পেয়েছে। পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই কাঠির আগুন একে বলে, ‘এখনও বলছি, নিজে গোছাও, তা নাহালে আমিই ডাকাতি করে লুটে নিয়ে যাব।’

‘তুই আবার ডাকাতি করবি?’

বিদ্রূপ বলসানি সিগারেট ধোঁয়ায়, ‘সাধুবাবা হব ভেবেছ?’

‘জেল তোকে ভাল করল না!’

‘আরও পাঁচ শিখিয়েছে অটলদা, সঙ্গী দিয়েছে, কোলিয়ারি ফিভেও রাজু সিং ডাকবে আকসানে। থাক্ উ সব ছাড়—চা কর। অনেক বকলাম। তুমি শালা কোনদিন মানুস হবে না অটলদা—হ্যাঁ।’

চা করে নিজেও এক কাপ খায় অটল। বলে, ‘শাখার খবর জানিস?’

‘জানি।’

‘তোমার কণ্ট হয় না?’

‘কণ্ট কিসের! মেয়েমানুষ নিয়ে বড় হুজুজাত। ভালবাসা শালা বহুত খতর-নাক। খসে শালা ভাল করেছে।’

অটল অপরিচিত ভাষা শোনে। জগা আগুন, দহনই ধর্ম। জেলে একটা

মানুষকে ভাল করার বলের আরও উগ্র সাহসী করে দিয়েছে। বলে, 'আমিই
কোথা এখন তুমি?'

'আমার থাকার ভাবনা। চণ্ডী তোমাকে তাড়ালে পাশে দাঁড়াবে। আর জেল
থেকে আমি বেরুতে এ ডাকে সে ডাকে। জগার মূখে আল্লাদ খোলে।

ভাবা যায়। ধূগা, দাগী, ডাকাতির এমন আদর মিথ্যে বলছে না তো। হু
ওঠে অটলের, 'বলিস্ কী! তারা কারা বটে রে? কুখ্যকার?'

'নাম শুনেন কী কাজ! আমার পাশে দাঁড়ানোর কত লোক। তবে বলতে পার
লুকিয়ে ছাপিয়ে, আঁধাবে, গুপনে গুপনে।'

'দাঁরে গাঁয়ে নাই। ওর মা না খেতে পেয়ে মরেছে। পেছাদা ভিক্ষে করে সাঁইথেতে।'

'জানি।'

'অধর্মের লেগে দলের এমন দশা, চেতন হয়না তোর!'

'দল আবার কী! ডাকাতির দল ভাঙে আর গড়ে। ভাড়া করলেই হল।'

'ভাড়া। ডাকাত ভাড়া।'

'হ্যাঁ। যেমন মুনিস লাগিয়ে কাজ করায়। বলতে পার হাম্মার করা। হাম্মার
করে খেলায় প্রিয়ার আনে জান ত। খেলার পারাই বটে, তের্মনি। টাকা দিয়ে দল
গড়ে নিতে হয়, এরকম থাকে না। চণ্ডী তাড়ালে আমি তোমাকেও হাম্মার করতে
পারি, এক রাতে চার-পাঁচশ পাবে।'

অটল ভেঙে পড়া মানুষের মত বসে থাকে। জগা ঢের অচেনা।

'তাহলে তোমার ঘরেই ঢুকব। চূপচাপ যা জমিয়ে রেখেছ নার করে দেবে।
চলি।' জগা হেসে যেন ডাকাতিটা মজার, নিতাইই কৌতুক, ইয়ার্কির টঙে চোখ
নাচিয়ে চলে যায়।

জগার আসা অনেকেই দেখেছে। নুটু গেরন্ত দিগ্ভ্রাসা করল, 'দে'তো জগা
এসেছিল তোর কাছে? পাড়া দিবি না। ডাকাতি হলে তোর ঘাড়ে পড়বে।
চারুপিস ঘর বয়ে সাবধান করে দিয়ে গেল। নানু ক্রবর্তী কথা বলে না, বললে
ক্রোধান্বিতবর্ণ, মওকা পেয়েছে, 'এই যে বামুনের বেটা, ডাকাত পুষছ আবার। ঘাড়
থরে বার করে দেব। পাখা বোরিয়েছে।' অটল জানে, লোকটা ভাড়িয়েই দিত।
অবিনাশের বিপক্ষ দলের লোক, তাই বঁচায়। অবিনাশ প্রধান, তার সহায়, দেখা
হুতে বলে, 'জগাকে ঘরে ঢুকতে দিবি না। হারামজাদা জেলে ছিল ভাল ছিল, এখন
কী করে দেখ। আমি সবাইকে বলে দিয়েছি জগাকে কেউ যেন আশ্রয় না দেয়।'

জগার আগ্রহের অভাব নেই, এ ডাকে সে ডাকে, অটলের মনে হয় কথাটা সে

প্রধানকে জানিয়ে দিলে পারে। কী দরকার! ও নামটাই সে ভুলে থাক। তবু এসে পড়ার ভয় থাকে। না, চণ্ডীর জন্য আগলানো ঝিন ডাকতি করতে আসবে না, আসবে তার কাছে বসতে, গল্প করতে। কিন্তু কী লাভ! ধর্ম যে মানে না। বৃক্ষের মধ্যে ধর্মবন্দী বৃদ্ধিয়ে কাঠ। না, অটল তে, পারল না নদীতে জল বইয়ে দিতে। ভাবতে বড় কষ্ট হয়।

দুটো গাইয়ের 'ধুড়িয়া' হয়েছে। বড় ছোঁয়াচে। শক্ত ধূরের খাঁজে ঘা, হাঁটতে পারে না গরু। 'ধুড়িয়া' অন্য রোগও জানতে পারে। আলকাডরা দিলে ঘা শুকিয়ে যায়। কিন্তু দিনকাল বড় খারাপ। শিবপুরে ওষুধ আনতে যায় অটল। সেখানেই বাস মোড়ে বংশীর দোকানে বেষ্টিত জগা বসে আছে। জগা তাকে দেখেও দেখে না, ঝটলও গ্রাহ্য করে না। এরপর আর দেখা নেই। বিহার বজারে আমজোড়া গাঁয়ে ডাকতি হয়েছে শুনে জগার কথা মনে পড়ে মাত্র।

সন্ধ্যালগ্নে গাঁয়ে হৈ চৈ। চটাই ঘোষাল পেঁপে চুরি করতে নটু গেরস্তর খামারের উঁচু পঁচিলে উঠেছিল। পেঁপে পাড়বে কী, উঠে আর নামতেই পারে না। এদিনে রাত ফুরিয়ে সকাল, দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বেচারি এখন মজার দৃশ্য।

চটাইয়ের ছোটখাট চেহারা, ছোট মাথা, গায়ের রঙ আধফরসা, বয়স হলেও গড়নের জন্যে ধরা যায় না। সাজগোজে ফিটফাট, শূঁতির উপর শার্ট, হাওয়াই চম্পল, বাগানো টেরি, ঘাড়ে গলায় শীত গ্রীষ্ম নেই পাউডারের গুঁড়ো, যদিও প্রয়োজনে লাগে না, তবু জামার বুক পকেটে একজোড়া পেন থাকে।

এ চেহারা গাঁয়ে। দ্বরাজপুর পাণ্ডবেশ্বর কী লোকপুর থানা এলাকায় গাঁ ঘরে চটাই ভিক্ষে করে বেড়ায়। পোশাক ব্যাগবন্দী করে ছেঁড়া লুঙ্গি গেঞ্জি পরে, ঘাড়ে গলায় পাউডারের ছোপ মুছে। সবাই এটা জানে। বলতেও ছাড়ে না, কিন্তু চটাই মানতে চায় না, লোকের দরজায় চাইতে পারে, কিন্তু মোটেই ভিখিরি নয়। একা মানুষ, সংসারে কেউ নেই, কোন দৃখে সে ভিখিরি হতে যাবে। ছেলেরা পিছনে লাগে, 'ভিক্ষে করে চটাই / ঢেব পয়সা কামায়।' চটাই ছেলেদের গালাগালি দেয়। লোকে যদি বলে, 'রাগিস্ কেনে, রাগিস্ বলেই ছেলেরা অমন করে।' চটাই বলে, 'ভিখিরি বললে সম্মান থাকে। সম্মান গেলে আর রইল কী।'।

চটাই ছিঁচকে চুরিচানারি করে। তবে ওই, কুমড়ো লাউ পেঁপে কলা, কোন দামী সামগ্রী নয়। ধানের সময় মাঠে ঘুরে ঘুরে শীষ ছিঁড়ে বেড়ায়। চুরি অভিযোগ ঘর বয়ে কেউ নিয়ে গেলে সাফ কথা, 'দরকার ছিল নিয়োছি, তোমার দরকার থাকলে আমার ঘর থেকেও নিয়ে যেও।' কেউ যদি বলে, 'তাহালে তোর এই

বালাতি নিলাম ।’ ওঝনি চটাই হাঁ হাঁ করে বালাতি আঁকড়ায়, ‘আমি কী দেখিয়ে
নিজেছি, তুমি যে বড় দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইছ ।’

পাড়াসদৃশ মানদুশ নুটু গেরস্তর পাঁচিল গোড়ায় । চটাই ঘোড়া চরা করে
বসে । লোকে হাসাহাসি, জিজ্ঞাসা মন্তব্যে সকালের মজা উপভোগ করছে, জ্বাইয়ে
রাখছে ।

নুটু গেরস্ত বলে, ‘চাপলি কী করে ?’

‘সে কী আমি জানি । তখন তোমার দেওয়াল এত উঁচু ছিল নাকি ।’

‘ভাগ্যিস চাপলি তাই উঁচু হল ।’ নুটু গেরস্তও রসিক মানদুশ ।

‘নামাও দেখি । পেঁপে চুরি করতেই পারি নাই । চোর বোলো না ।’

‘নামাতে পারি । তবে একটা সত’ । তোর ও খুব সম্মান ।’

‘বটেই ত । সম্মান গেলে আর রইল কী ।’

‘ঠিক আছে । বাঁকি আনছি তোকে নামাতে । জোরে জোরে বল, ভিক্ষে করে
চটাই, ঢের পয়সা কামায় ।’

মুখ গোঁজ করে থাকে চটাই । তবে শেষ পর্যন্ত বলে । হুজোড় ওঠে নিচে ।
‘বাঁকি লাগিয়ে চটাই নামতেই জেলেরা চুঁচাৎ, ভিক্ষে করে চটাই, ঢের পয়সা কামায় ।’
চটাই গালাগালি দেয়, পা ঠোকে, হাত ছোঁড়ে, মারতে যায় । ‘তুই তো নিজেকে
স্বীকার করলি’ বলাতে সদপে বলে, ‘সে গো উঁচু পাঁচিলের ওপর । আমি কী
এখন পাঁচিলে আছি ?’

অটল হাসির হুজোড়ে, রসিকতার কথায়, দেখায় কোন মজা উপভোগ করে না ।
চটাই ঘোষাল স্ক্যাপাটে মানদুশ, তার দৃশ হুজিল । পিঠে হাও পড়তে ঘাড় ফেরাল,
শ্যামদাস, সেই তিলক চন্দনে, কাঁধে ঝোলায় খজনিতে, ঠোঁটে পুত হাসির ধারায়
সারল্যের সাদা পদ্পশোভায় । ফিস ফিস করে বলে, ‘ঘর চল । তোমার ওই
পাঁচিলের লোকটার দশা হবে না ত ! পেঁপেও পেলে না, নামতেও পারছে না, এদিকে
চেপে গিয়েছে, পাঁচিল ঘোড়া, ছোটে না—রাখে কৃষ্ণ ।’

‘কী যে বল, বুঝি না ।’

‘রাখে কৃষ্ণ, তোমাকেও যে নামতে হবে । শোন নাই শুনবে । পোস্তমান্টারের
সঙ্গে দেখা, চণ্ডীদাসের চিঠি এসেছে, মাকে লিখেছে গায়ে আসবে ।’

অটল দাঁড়িয়ে পড়ে । পলকহীন দৃষ্টি শ্যামদাসের উপর ফেলে, যেন চকানিটা
হজম করে নিল ! বলল, ‘ভালই হল । আর দায় বইতে হবে না । তোমার সঙ্গে
বোঝিয়ে পড়ব ।’

‘বল কী। একেবারে বৈরাগ্য। রাধেকৃষ্ণ, শূন্যের শোকে বীরগী হলে, সংসার ছাড়বে—আমি তো জানতাম তুমি ভিন্ন পাঠ।’

‘আমার সংসার কোথা যে ছাড়া দর।’

‘দুঃখের আঁশটে গম্ব কেনে বাবাজী, দীর্ঘ-বাস কেনে?’

‘দুঃখ কিসের। ঠাকরুণ বৈঠে থাকলে কত ভাল হত।’

‘এহাংলে তোমার সুখভোগ হত না, জীবনের কারবার ধারে হয় না, সব নগদে। রাধেকৃষ্ণ চল ঘর চল, চা মূড়ি খাওয়াবে।’

চা মূড়ি খেয়ে শ্যামদাস বলে, ‘চিন্তায় পড়লে, রাধেকৃষ্ণ, চিন্তা থাকলে মানুষ কী, তবে বেশি পাকাবে না, তোমার ধর্ম-নদীতে বান ডাকাও, ভাসিয়ে নিয়ে যাক পরের ঘরে সুখের বাস। শূন্য জলের কলকল ছিলছিল, দু’পাড়ে দেখে সবুজের ডেউ, রোদে ঝাঙাসে আনন্দ লহরী, রাধেকৃষ্ণ।’

শ্যামদাস ভাত খায় না। বলে, ‘পেটের বাঘ বলেছে খাব না এখানে। পাকের ঢাকা সরসর করছে, খাবি কী করে বাবাজী—রাধেকৃষ্ণ—চলি।’

চণ্ডীদাস চক্রবর্তীর প্রত্যাবর্তন গোপালপুরের এক জন্মের সংবাদ বটে। ঘরে উঠোনে দাওয়ায় গ্রামের মানুষ ভাঁড় করে। চণ্ডীদাস সূরাটের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করছিল এতদিন। নানা জায়গা ঘুরে সূরাট পৌঁছান তার সেও এক বিচিত্র বৃত্তান্ত। বাহোক মায়ের কথা তার মনে হত বৈকী। ভেবেছিল অনেক টাকাকড়ি নিয়ে সে ফিরবে, মাকে দেখাবে ছেলে তার নিজের জোরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। সে কারণেই আসেনি, চিঠিপত্রও দেয়নি। এই যে এসেছে এটা হঠাৎই ঘটে গেল। অসুখ করেছিল। অসুখ ভাল হল কিন্তু মায়ের জন্যে মন কাঁদা থামে না। তাই ছুটে এসেছে।

চণ্ডীদাস তো বলে, তবু লোকের কতই না জিজ্ঞাসা, কতই না সমাদার, যেন গাঠের মানুষ হা-পিতোষ হয়ে বসেছিল, চণ্ডীবিহনে গাঁ খাঁ খাঁ করত। নান্দু চক্রবর্তী ঘর বয়ে এসে বলল, ‘বেশ করলি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলি। গাঁ না মা। মা না থাকলে কী হবে, গাঁ তো আছে। আমরা কী পর। আজ আমার ঘরে খাবি। জল-খাবারও পাঠিয়ে দিচ্ছি।’ তো নেমন্তন্ন করার জন্য ব্যগ্র সব পড়শীই। স্নেহ করানিও কথায়, ‘চেহারা কী করেছি।’ কী সুন্দর তোমার চেহারা ছিল।’

অটলের মনে পড়ে না। তবে এখন দেখে, ক্ষয়া বৃড়োটে চেহারা, চোখ ঢোকা, ফরশা রঙ কালিবর্ণ, হাত পা শির ওঠা, কেঠো, আঙুল শূন্য কাঠি, পোশাকেও

বোকা যায় মানুষটা সুখে ছিল না। অভাবের হাতে ছুঁরি থাকে, চেহারায়ে সে দাগ টানে।

গাঁয়ের লোক সরতে অটল বলল, 'তাহালে নিজের জিনিস বুছে নাও। আমার দার মিটুক। ঠাকরুণকে কথা দিইছিলাম, সাধ্যমত রেখেছি।'

শিবপদর মোড়ে নামার পর থেকে এই মানুষটা সম্পর্কে তের কথা শুনেছে। ভাবে-ভঙ্গীতে কথায় বোকায়াই মনের ভাব। এখন বলে, 'তুমি যাবে কোথা? থাকবে আমার সঙ্গে।'

'গেরস্ত আমার থাকা ছিল আগুলতে। তুমি এসেছ।'

'তো কী হয়েছে। আগুলবে, আমাকে রান্নাবাড়া করে খাওয়াবে, ঘর দেখবে।'

অটল জিত কানে, 'নামদনের ছেলে আমার হাতে যাবে কী গো।'

'সে বুঝব আমি। আপত্তি কিসের। গাঁয়ের লোকের জন্যে।'

অটল বলল, 'রাঁধার অনেক লোক পাবে গেরস্ত।'

'না। তুমিই থাকবে। তোমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি, তোমার মত মানুষ হয় না।'

অটল এতটা ভাবেনি। বিদায়ের প্রস্তুতি গড়ে নিয়েছিল, এখন একথায় তার মনে হয় দার ফুরোয়নি। একজন ভালমানুষের জন্যে একা মানুষের জন্যে তার থাকা কতব্যও বটে। এতদিন অন্ন খেয়েছে, সে তো ঋণী। ঠাকরুণের কাছে, তার বেটার কাছে।

সংক্ষেপে চণ্ডী বলে, 'যাও দেখি একটা বোতল নিয়ে এস তারকের ঘর থেকে — লুকিয়ে আনবে।'

অটলের উপর হুড়হুড় করে যেন পড়ে যায় ঘরের চাল। ভাদুরে সন্ধ্যার চাপা গুমোট বাতাস ছিনিয়ে নেয়। ভাবে, একবার গাঁ ঘুরে এসে, তারক ঢোলাই বিক্রি করে সংগ্রহ করে ফেলেছে, ঠাকরুণের বেটা মাতাল, বাইরে এক ভেতরে অন্য এই মানুষ, আঘাত দেয়, কষ্ট হয়। কাঁপা ঠোঁটে বোঁরয়ে আসে, 'তুমি মদ খাও!'

'আরে অবাক হবার কী আছে! খাবার জিনিস খাব না!'

'মদে সর্বনাশ হয়, মানুষ নষ্ট হয় গেরস্ত।'

চণ্ডী ঠোঁটে বিড়ি রেখে আদেশ দেয়, 'যাও নিয়ে এস।'

অটলকে আনতে যেতে হয়। এবং দিনগূলি তার কাছে কালো হয়ে আসে। শূন্য তো মদ নয়, আহায়ে, জামাকাপড়ে, লোক আপ্যায়নে চণ্ডীদাস বিলাসিতা শূন্য করে দেয়। শূন্য হাতে এসেছে। অটলের জমানো ধান বেচা টাকায় তার:

হাত। না, নিজে হাতে নেয় না, অটলকে আদেশ দেয়। গাঁয়ের লোককে বন্ধিয়ে নেয়, সন্ধ্যাটে তার বিশাল উপার্জন হয়েছে। গোপালপুর অবাক হয়।

রসপুরের ফুটবল টুর্নামেন্ট তিনমাস আগে শুরু হয়েছে। সপ্তাহে একদিন রবিবার খেলার আয়োজন। তারপর বৃষ্টি, চাষের ব্যস্ততার, গ্রীষ্ম ছেড়ে শরৎ শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গায় হায়ার করে অনুষ্ঠান খেলার। যে গাঁয়ের খেলা তাদের একটাও ছেলে নেই, সব প্রেমার হায়ার এমনও হয়। লোকে খেলা দেখতে চার ভাল। নিজেদের ছেলেরা আর কী খেলবে। এই খেলাও যেন অঞ্জলি আমোদ। গোপালপুর সেমি ফাইনালে উঠেছে।

প্রব ক্যাণ্টেন, সেক্টরারি অঞ্চলকে ভেঙে পাঠাল চণ্ডীদাস।

‘অঞ্চল গোপালপুরে শীল্ড আনা চাই।’

‘ফেমল করে আনব কাকু। সেমি ফাইনালে কোনক্রমে উঠছি। রসপুর পান’পুর থেকে ফুল-সেট আনছে অগ্রগামী। শীল্ড ওরা গাঁয়ে রাখবেই।’

‘তোরাও আন। অগ্রগামীকে যারা হারাতে পারে।’

‘দুমকাতে রয়েছে। ওরা অনেক টাকা চাইছে।’

‘দেওয়া হবে। আমি দেন। জিওলে খাসি কেটে ফিফ্ট হবে।’

‘তুমি দেবে, তাহালে বাবস্থা করি।’ অঞ্চল ব্যস্ত হয়।

‘হ্যাঁ কর, গাঁয়ের মান রাখতে হবে। শীল্ড চাই-ই।’

গোপালপুরে শীল্ড এল, খাসি কেটে ফিফ্ট ব্যাগপাইপ বাজনা নিয়ে গাঁ ঘোরা। গাম্বুন ঠাকরুণের সোনারহাট, কানের দুল, আংটি গেল। না, অটলকে বিক্রি করতে হয় না। নান্দ চক্রবর্তীর ঘরে শুধু পৌছে দিয়ে আসা। চণ্ডীদাসের জন্যে নান্দরই বোঁশ দরদ।

অটল বড়ই বিপদে পড়ে। নান্দ চক্রবর্তীর তার উপর ঈর্ষার আগুনে চণ্ডী ইশ্বন হয়ে পড়ছে। প্রধানকে সে বলে, নুটুগেরস্তর কাছে ছুটে যায়। ওরা বলে, তোর কী। চণ্ডী সেরকমই আছে। স্বভাব কবে কোথায়। নিজের ধন ও ওড়ালে বলার কী আছে। ফলে অটনের প্রতিরোধহীন অসহায় মর্দুশিপাক, বৃকে দোমডান কষ্ট, ঠাকরুণের ধন নিঃশেষিত হওয়ার হাহাকার, চণ্ডীর বিলাস উদাসীন্য, মদ্যপানের প্রতিক্রিয়ায় নিঃপ্রভতা নিয়ে দিনযাপন।

‘গেলন্ত একডুং বৃকে চল।’

‘জ্ঞান দিও না। কাজ করে যাও।’

‘সব শেষ হয়ে গেল।’

শেষ হয়ে গেল বলে একটু আনন্দ করব না ? দুটো পরস্পর খরচা করি, একটু মদ খাই। সংসার নাই, মেরেমানুষ নাই, বিরক্ত করো না তো ! কাজ কর। চণ্ডী-দাস সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ শুন্যে ছোঁড়ে, বাতাসে ভাঙে।

ভাতের শেষদিকে অটলকে না জানিয়ে চণ্ডীদাস নিরুদ্দেশ হয়। যেন সে কয়েকদিনের খেলা করতে এসেছিল। বর্ষা শাস্ততার পর নিমেষ আকাশ কাল থেকে আবার মেঘে সেজেছে, টিপটাপ বৃষ্টি, মৃদু হিমেল সামান্য ঝড় নিয়ে আঁধারে দিনের পারম্প্রদল। তার মধ্যে এঘর-ওঘর ঘোরা, নানাঙ্গনে জিজ্ঞাসা, শিবপূর মোড়ে বাস দেখতে পাওয়া অটল উদ্ভিগ্নতার না খেয়ে দুর্ভাবনা বোঝা মাথায় নিয়ে দাওয়ার আলো জ্বললে বসে থাকে। সামান্য শব্দে চমকায়। বিনীত রজনী একসময় শেষ হয়, আলো ফোটে। আকাশের মেঘ সরে যায়নি। অলগা বৃষ্টির ধারার বাতাসে দোলানি খেয়ে ফেরে। উঠান ভিজছে, ঘরের চালের ধারাপাতের শব্দ। ঠাকরুণ যে দায় দিয়ে গিয়েছিল। অটলের মনে হতে থাকে, তার চেয়েও বড় দায় তার উপর বর্তেছে। চণ্ডীদাসকে সে যে কোথায় খুঁজে পাবে।

খোঁজার প্রয়োজন হয় না। অটলের দায়ও থাকে না। নান্দ চক্রবর্তী ছাতা-মাথায় বাতাস শোনায়, 'ওরে অটল পথ দেখ এবার। চণ্ডী ওর ছাবর-অছাবর সব বেচে দিয়ে গিয়েছে আমাকে, মায় গরু বাছুর, ঘরের সামগ্রী। সিউড়ী কোটে' রেজিষ্ট্র হয়েছে। মৃদু মানুষ দলিল বুঝবি কী, তোর পেধানকে বলবি, ইচ্ছে হলে দেখে যাবে। দু' ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। দখল দু'ব। সরে পড় ভালয় ভালয়।'

অটল অবাক হয়। টের পেয়ে নিভার হয়ে গেল সে। বসে ছিল, উঠে বৃষ্টি কিরিঝলানিতে কাদাটে উঠানে দাঁড়িয়ে বলে, 'দখল লাও গেরস্ত। আমি চললাম।'

'আরে তোর জিনিসপত্র।'

'এক জামাকাপড়ে এসেছিলম, ঘেঁছিও। বকনট রইল, গাভিন্ বটে।'

'তোর বকন কোথা ! হ্যাঁ, ওটাও আমাকে বেচেছে।'

'তাহলে ত ভালই। কোথা রাখতম্ তার ঠিকঠিকানা নাই। চাঁল গেরস্ত।'

হতভম্ব নান্দ চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষ এত সহজও হয়।

বিকলে বৃষ্টি মোছে। শরৎ ঝকঝকানি রোদ, আকাশ বিশাল নীল শাড়ির ফুলে ওঠা দিগন্ত বিস্তারী ছত্র, সাদা কাশফুলের সোহাগ হাসি খালের ধারে, ধানের ক্ষেতে সবুজ তরঙ্গ, পাতলা হিমের সকাল সম্মুখে—পূজো আসছে। খুঁশির বাজনা প্রকৃতির নুপুরে নানাভাবে বাজে, মানুষের হৃদিতে তারই দোলাচল। কিন্তু চকা গোপালপুর কেন্দ্রিক গ্রামগুচ্ছে যে শ্রেণীটির সংখ্যাধিক্য! তাদের কাছে শরৎ আগমন

তো, কর্মহীনতার, অসহনতার, ঘরে হাঁড়ি শূন্যতার, পিতল কাঁসা কী অন্য সামগ্রী দেখে দেওয়ার অসহনতার। এক ফসলী জমি সেই অগ্রহারণে ধান দিয়েছে। চাষ লাগতে মৃদু মৃত্ত হলেছিল সম্পন্ন চাষীর, বাবুদের, মিততে মৃদুত্ববান। সবুজ শস্যভূমি আগামীর সম্ভাবনার বাড়ি দোলায়, ধানের পাতার অপেক্ষার শিশির জমে।

দুঃখের এই কালে অটলের সব খুঁইয়ে চকায় প্রত্যাবর্তন আত্মীয়তা পায়। পরিদ্রুপে দারিদ্র্য বিমুখ করে না। খারা ঈষার জ্বলছিল, তাদের নিবৃত্তি সূত্র হয় না অটলের পনগর্ভ ছিল না। ফলে এ অবস্থার জন্য 'বেশ হয়েছে' উৎফুল্লতা কারও নেই। সাম্প্রদায়িক দিতে ঘরে আসে পরেশ, মৃদু এনে দেয় মালতী। ভূতো বলে, ভাবনা কী আমরা আছি। এদিকে গাংঠিপাল নাই, ঘরের চালে খড় নাই বেকারি মাই, কাজ নাই, অগ্নের কোন সংস্থান নাই, দেওয়াল বয়ান কতাবিকৃত, অব্যবহারে সাপথোপের প্রান্তনা হয়েছে, দু'চারটে টিন, মাটির হাঁড়ি, বাগতি, এলুমিনিয়ামের থালা বাটি, কাঁথা, টিনের বাস্তু ছিল, কে কখন বের করে নিয়েছে, কে জানে, এ সব সংগ্রহ করতে হবে। ভুলো ঘরের সামনে উদাস হয়ে বসে থাকতে দেখে ডেকে নিয়ে যায়, খেতে দেয়। তবে একদিনই। পরদিনই সে ঘর পরিষ্কার করে। মিতি একটা খেজুর-পাতার তাল্লাই দেয় শোবার জন্যে। কুমোরঘরে ধারে মাটির হাঁড়ি, একটা পাতনা কিনে আনে, রাম সাধুর মৃদুর দোকান থেকে ধারে চাল, রাগা করে খায়। ধার সে শোধ করে দেবে। দিতে কেউই ব্যাজার হয়নি। সঙ্গে মহানুভূতিও দেখিয়েছে। দিবা সে রাত কাটায় খড়ের ছাউনিহীন শূন্যঘরে।

নান্দু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অটলের জন্যে কেউ যায় না। নিষেধ করে অটলের কাছে। তোলে অধিকার, ভোগ দখল সূত্র ইত্যাদিও। প্রধান অধিনাশ বলল, 'দলিল যখন করিয়ে নিয়েছে কিছু করার নেই। কিন্তু গাভিন বকনটা তোমার। ওটা আদায় করে দিতে পারি। পণ্ডায়েতে তোমাকে নিয়ে কথা হাঁচ্ছিল।'

'দরকার নাই পেধানবাবু। ওখানেই থাকুক।'

'আরে চোরের উপর রাগ করে করে ভুঁইয়ে ভাত খাবে!'

অটল বলল, 'আমার ত রাগ হয় নাই। আহা ঠাকুরের ছেলেট—।'

'আহা করছ কী! তোমার কথা ভেবেছে! ও কী একটা মানুষ!'

অটল বলে, 'মানুষই বটে। তবে অশ্বমের—।'

অধিনাশ বলে, 'এ সপ্তাহে কাজ তুমি পাবে। ইলেকট্রিকের পোল পড়ছে। কন্সট্রাক্টর স্থানীয় লেবার নেবে।'

লাল রঙের নতুন সাইকেল নিয়ে জগা আসে। ঝকঝকে সাইকেলের মত জগার

চেহারাতেও ককমকানি। শীর্ষ রেখার গোঁফ, দাড়ি কামান, নীল সোজা, সাদা প্যাণ্ট, হাতে বাড়ি। হেসে বলল, ‘আজই তোমার খবর পেলাম। জানতাম শালা এলেই তাড়াবে শূন্য হাতে। টাকা উড়ছে শূনে লুটে নিবার মন হয়েছিল। তুমি রইছ। শেষে দোষ পড়বে তোমার উপর—চুপ্ মেয়ে গেলম। তা ছাড় ইবার ভালমানুষী। নান্দ চক্রবর্তীকে দেখতে হলে আমার সঙ্গে এস!’

জগা ধামতে অটল বলল, ‘তুই আমার কাছে আসিস্ না জগা। ভেবেছিলাম ভাল হবি—আমি হার মেনেছি।’

‘আরে ভাল হলে ত তোমার দশা হত। খেতে পেতাম্ না। সারা জীবন ভাল হয়ে হিসেবট দেখ, পেলে কী? চিরকাল গরুর লেজ মচড়ে গেলে বাগালিগিরিতে, বর্গাদার হবার ভাগ্যা হল না, বোকে বিনি চাঁকছেতে মারলে, ভালবোদিকে সংসার দিতে পারলে না, মাথায় চাল নাই আকাশ মাথায় নিয়ে তালাইয়ে শূঁছ, ভালমন্দ খাবে কী, পেটে ভাত নাই, উপকার করলে—তাড়া খেলে। আমাকে দেখ। শাঁখার কথা বলবে? মাগীর অভাব, রাণীশ্বর চল, চাঁপা আছে, শাঁখার ডবল ভালবাসা, ডবল সুন্দরী। অভাব নাই। বিলিতি খাই, মাংস খাই, জামা প্যাণ্ট দেখ, লোকে ডরায়, রাজার মত থাকি।’

‘তুই কী এ সব কথাই শুনতে এলি?’

‘জানি কাটা খায় নুনের ছিটে লাগছে।’ জগা বসে না। সিগারেট ধরায়, দোয়া ছাড়ে। বলে, ‘একদিন বাঁচিয়েছিলে, সেই টান ভুলতে পারি না, জেলে বসেও তোমার কথা মনে হত। তুমি ভুল না আমি ভুল। তা দেখাছ শালা তুমিই ভুল। না এসেও এম্ পারি না। তুদু করেছ আমাকে। আমি বেঁচে আছি, তুমি মরছ।’

‘তুই বেঁচে কোথা! তুই ত মরা।’

‘অ্যা। জগা হা হা করে হাসে, ‘কে মরা, লোককে শূধোও। শুরু করতে পারি না। শোন, শিবপুর মোড়ে বংশীর দোকানে খবর দিলেই আমি আসব।’

‘তোর লেগে আমার কণ্টে হয় রে জগা।’

জগা বলে, ‘হয়—তাহলে চলে এস!’

অটল সন্দেহে ডাকে, ‘তুই-ই আর জগা।’

জগা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কোন কথা বলে না, সাইকেলে ওঠে।

পরদিনই অটল ইলেকট্রিক লাইনে কাজ পায়। ‘বদমাশ আসবে গাঁয়ে, নুটে গেরস্ত বলে, বর্কনি আলো আসছে। এরপর টিভি। শিবপুর থেকে রাস্তাটাও হয়ে যাবে। বাস আসবে গাঁ পর্যন্ত। চকা ছেড়ে কাজ করতে বাইরেও যাবে গাঁয়ের মূনিষ। তখন উন্নতি দেখাবি। এ ঘর করাইস, লাঁশ গড় আমি দেব—কাজ করে শোধ দিবি।’

অটল মাটি কাটে, জলে ভিজিয়ে ‘ভাওয়ান’ মাখে পা দিয়ে, পরদিন দেওয়ালে মাটি দেয়। এ কাজটা সকাল সন্ধ্যা। আটটা থেকে পাঁচটা মজুর খাটে ইলেকট্রিক লাইনে। চরম পরিশ্রমেও ক্লান্তি অনুভব করে না। পূজোর দুর্গাগত গম্ভে সে

আনন্দ সোরণ্ড পায়, আকাশের নীল, পাখির উড়ন্ত ডানা, ধানক্ষেতের হরিৎ চেউ, নিমগ্ন শিশির পাত, বাতাসে হিম হিম আদর সকলই যেন ঝুশির বাতাবহ। জটিলের যেন অতীত নেই, অনুশোচনা নেই, চিন নেই, ডাল নেই, শিখা নেই, জগা নেই, বামন ঠাকরুণ নেই, চণ্ডীদাস নেই, নান্দ চক্রবর্তী নেই, চকা নেই, গোপালপুর নেই, প্রাপ্ত নেই, অপ্ৰাপ্ত নেই, বেদনা নেই, বিষমতা নেই। অনেকদিন পরে বৃকের নথ্যে তার সরবতা ধ্বনদীর। তালাইয়ে শূন্যে রাত্রের আকাশ সে ঘরশূন্য চালের ফাঁকে দেখতে পায়। খাঁড়ত হয়ে নক্ষত্রের বাতি জ্বালায় আকাশ, সমাদরের চাঁদ জ্যোৎস্নায় ভাসায়, রাতচরা পাখির ডানায় চরা শব্দের রেখা আঁকা হয়, পাতলা ঘুম তন্দ্রার স্নেহ আবেশে সে শরীরের অভ্যন্তরে ধ্বনদীর বহমানতায় নিমগ্নিত হয়ে যায়। নদী বইছে কলকল ছলছল। শব্দ থেকে ধোঁয়া সরিয়ে ভাস্বর হয়, ক্রম উজ্জ্বলতা। অমৃত শ্রোতাম্বনীর আলোর মৃকুট নিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ গড়ছে। দ্বীপে তার সবুজ ঐশ্ব্যের সমারোহ, এঁকেবেঁকে পাহাড় অরণ্য জনপদের অলংকার সঙ্গে ভুড়ে পার হয়ে হয়ে বইছে। কত দূর কত দীর্ঘ যে সুন্দর নিমাণের যাত্রা—অজহীন, কালহীন। বোধ আর বোধহীনতার আলো ছায়া জলরাশির কেবলই শব্দ। কলকল ছলছল। নদী বয়, আনন্দ বয়।

একদিন সহদেবমাস্টার চেয়ারে বসে হাঁক পাড়ল, ‘এই অটল শোন শোন।’ কাছে আসতে বলল, ‘চলল কোথা? পোল ত পুঁতছিচ্ আলো কবে আসবে?’

‘তা কী করে জানব।’

‘রাস্তাতে পাথরও পড়ছে। দেখা যাক কবে হয়। ঘর তাহালে তোর হল। ইস্ কী ঠকান তোকে ঠকাল। কী সুখে তুই ছিলি।’ অটলকে চলে যেতে দেখে বলে, আরে যাবি এখন। তোর দুঃখ বুঝি—। দুঃখেরই তো কথা।’

‘দুঃখ কিসের গো আমার। দিবি আছি। ধ্বনদীর বান ডাকলে খালি আনন্দ।’

‘ধ্বনদী। ও আবার কী?’ সহদেবমাস্টার লু কৌচকায়।

‘শ্যামদাস বরিগাঁ বলেছে। সবায় বৃকে থাকে। হাত দিয়ে দেখ।’ অটল হাঁটে।

সহদেবমাস্টার ধন্দে পড়ে, বৃকে হাত রাখে। তারপর ভেবে নেয়, শ্যামদাস বৈরাগী বলেছে! আউল বাউল, বৈষ্ণববারিগাঁ, সাধুসহ, ওঝা আর গুপ্তবিদ্যাধররা আলটপকা ইঙ্গিতধর্মী বহু অর্থবহ গভীর রহস্যময় এরকম কথা বলেই থাকে। কাজ কী সংসারী মানুষের এমন জটিল ধোঁয়াটে ঘূর্ণিপাকে। তবে এটা তো ঠিক ধ্বনদী হোক আর অন্য কিছু নাম হোক, কিছু তো বটেই, আছেই, থাকেও নইলে বোকাটা এত কান্ডের পর এমন প্রফুল্ল থাকে কী করে।

বড় বড় চোখ করে সহদেবমাস্টার দেখে খাড়া একটা মানুষ লম্বা পায়ে হাঁটেছে।

